সাপ্তাহিক

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস পাণ্ডব গোয়েন্দা

আনন্দমেলা

২০ সেপ্টেম্বর ২০০০ দশ টাকা

পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণময় খেলার আসর ওলিম্পিক। ওলিম্পিকের সেরা দশজন খেলোয়াড়ের পদকজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী।

ওলিম্পিকের সেরা দশ

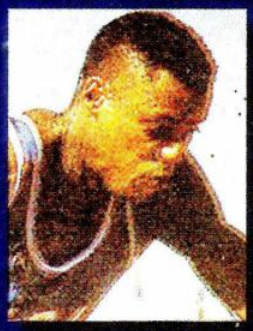

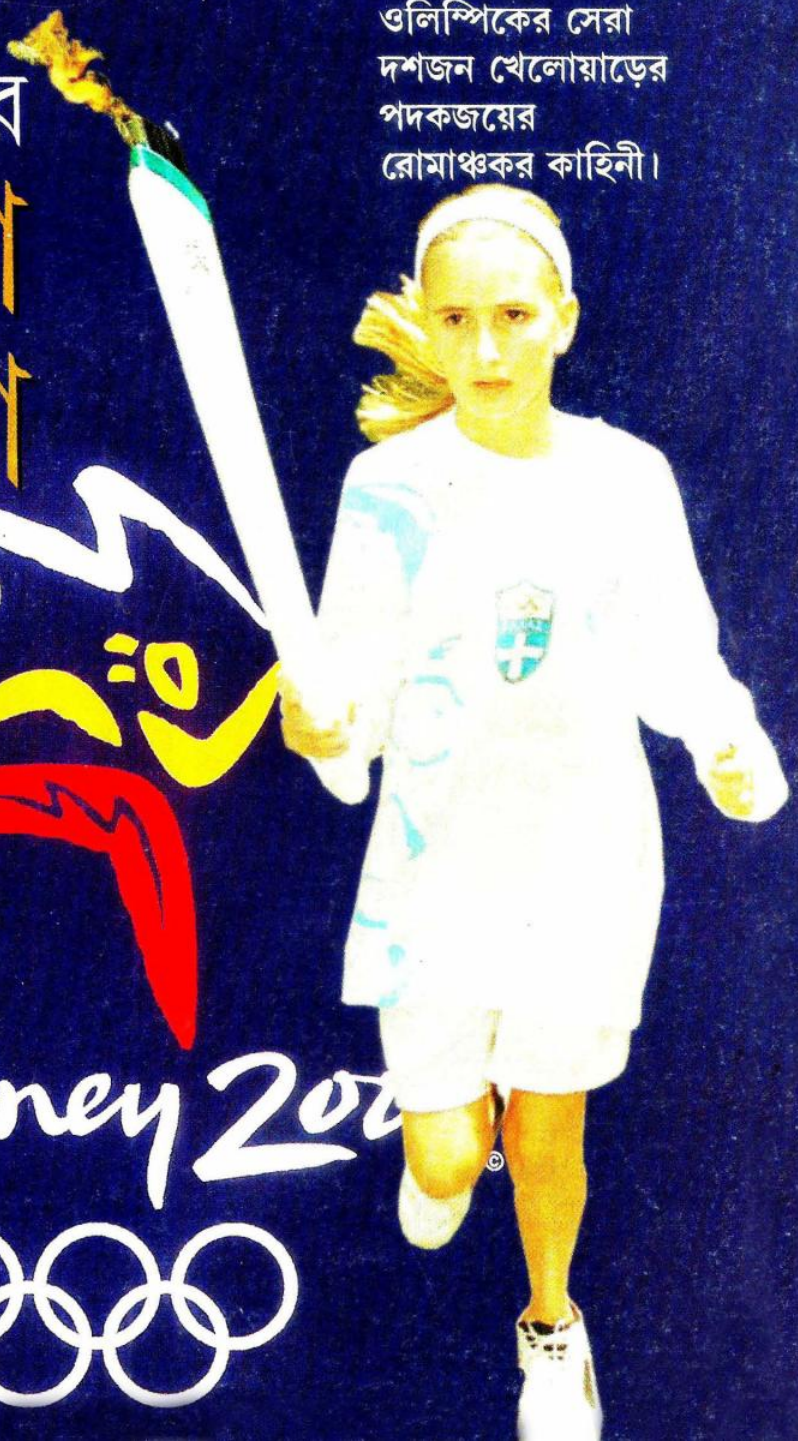

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - প্রশান্ত কর্মকার

স্ক্যান করেছেন - প্রশান্ত কর্মকার

এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার দুর্লভ / বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটি স্ক্যান করতে চান বা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান

তাহলে নিচের ইমেল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ঋতু অনেক,একই সাবান,সুলভ দাম।

বিভিন্ন মরশুমে আমাদের ত্বক নানারকম কার্যকারণ ও পদার্থের সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রীষ্মে আসে তাপ ও ঘামের প্রকোপ, শীতের সঙ্গে সঙ্গে আসে শুষ্কতা আর বর্ষাতে নানারকম ত্বকের সংক্রমণ। মেডিমিক্স-এ খাঁটি নারকোল তেলে থাকা 18-টি ভেষজের গুণ ত্বক ও চুল রাখে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, আর্দ্রতাময় ও দীপ্ত - সারাটা বছর ধরে, সবচেয়ে কম খরচে।

ভেষজ	ভেষজের ক্রিয়া
কুটজা, চোপচিনি, ভিডঙ্গ ও জ্যোতিষ্মতী	সৌন্দর্যবর্দ্ধক
উশীরম, সারিবা ও ধান্যকা	ঘামাচিনাশক
গুগ্‌গুল, দেবদারু ও নিম্বত্বক	জীবাণুনাশক
চিত্রকা ও দারুহরিদ্রা	ব্রণরোধক
বনার্দ্রকা, কৃষ্ণজীরকা ও জীরকা	ডিওডোর‍্যান্ট
বচা, বাকুচি ও যষ্টিমধু	খুসকিনাশক

100% ভেজিটারিয়ান সাবান। খাঁটি নারকোল তেলে তৈরি, এমনকি সমুদ্রের জলেও বেশি ফেনা হয়।

পরিপূর্ণ আয়ুর্বেদিক স্নানের জন্যে

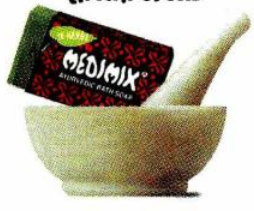

পরিবারের প্রিয়

মেডিমিক্স

সাবান

75 এবং 125 গ্রামের প্যাকে পাওয়া যায়।

www.medimixindia.com

Pen a Trait/DD-60/Ben

২৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৩ আশ্বিন ১৪০৭ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

প্রচ্ছদকাহিনী

ওলিম্পিকের সেরা দশ

১২ পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণোজ্জ্বল খেলার আসর ওলিম্পিক। শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছে আধুনিক ওলিম্পিক। আধুনিক ওলিম্পিকের সেরা দশজন খেলোয়াড়ের পদকজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়েছেন তানাজি সেনগুপ্ত। এ ছাড়াও ওলিম্পিক নিয়ে লিখেছেন শান্তনু ঘোষ , বিশ্বপ্রিয় নন্দী এবং উত্তম রায়।

প্রত্নতত্ত্ব

চন্দ্রকেতুগড়ের নীচে এখনও রয়ে গেছে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী

১০ কলকাতার কাছেই উত্তর ২৪ পরগনার মফস্বল শহর বেড়াচাঁপা। এখানে চন্দ্রকেতু গড়ের নীচে পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। লিখেছেন রাজীব চক্রবর্তী।

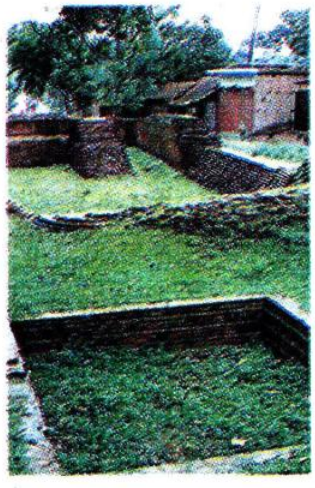

মাধ্যমিকের লেখাপড়া

এবারের বিষয় ইংরেজি, ইতিহাস ও অঙ্ক

৩৬ ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঠিক প্রস্তুতির সময় এখনই। তাই আনন্দমেলার প্রতি সংখ্যায় থাকছে সেরা শিক্ষকদের জরুরি পরামর্শ এবং প্রশ্নোত্তর। এই সংখ্যায় তিনটি আবশ্যিক বিষয়ের আলোচনা।

খেলাধুলো

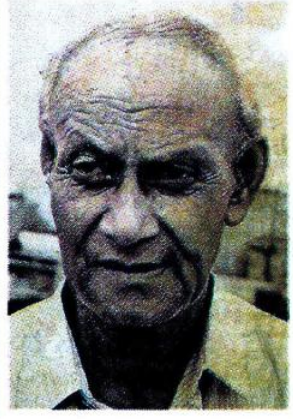

ফুলব্যাক

৬৩ ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে শৈলেন মান্না এক প্রবাদপুরুষ। খেলার মাঠের বাইরেও তাঁর জীবন নানা নাটকীয় মুহূর্তে উচ্ছল। বলিষ্ঠ ও ঋজু চরিত্রের এই মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন মানস চক্রবর্তী।

অন্যান্য বিভাগ

গৃহশিক্ষকের দায়িত্বও নিতে পারে...
• সৌরভ চক্রবর্তী ৪
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে
• ভাস্কর ৬
রোবট নিজেই তৈরি করছে
• সুব্রত রায় ৭
'লিট্‌ল প্রিন্স' বইটা...
• রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ৮
সাদা কাকের ঝাঁক
• রানা সেনগুপ্ত ৯
জার্মানির মাইনৎস শহরে...
• অশোক সেনগুপ্ত ২১
রক্তমাখা মুখ ধুয়ে...
• অশোক রায় ২২
পাণ্ডব গোয়েন্দা
• ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ২৩
মুরগির মাংস, চিংড়ির...
• অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী ২৭
গম্ভীরবাবার মালদা-যাত্রা
• শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৩১
আনন্দমেলা স্ট্যাম্প-ক্লাব
• অশোক সেনগুপ্ত ৪৫
ধাঁধালি • অমল ভৌমিক ৪৬
খাদিম-এর হজবরল ৫১
কুইজ ৫২
সবুজ পাতা • জয়ন্ত বসু ৫৭
টেলিভিশন ৫৮
ওলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে...
• চন্দন রুদ্র ৫৯
ম্যারাথন দৌড়ে ইতিহাস...
• সুজন ঠাকুরতা ৬০
ওলিম্পিকের খেলাধুলোয়...
• শান্তনু ঘোষ ও বিশ্বপ্রিয় নন্দী ৬১
সিড্‌নিতে গেইল ডেভাস...
• প্রতাপ জানা ৬২
খেলার খবর • দর্শক ৬৬
নিয়মিত কমিক্‌স : ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৬

প্রচ্ছদের ওপরের ফোটো পাভো নুর্মির। মাঝখানে ক্রিস্টিন ওটো। নীচে কার্ল লিউইস। অন্যান্য ফোটো এ এফ পি-র

সম্পাদক
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

এবিপি লিঃ-এর পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা। বিমান মাশুল কাঠমাণ্ডু, পোর্টব্লেয়ার, শিলচর, ইম্ফল, গ্যাংটক ৩০ পয়সা।

গৃহশিক্ষকের

ছবি দেবাশিস দেব

দায়িত্বও নিতে পারে ইন্টারনেট

এক গোছা চিঠি, একবাটি মুড়ি আর গোটা দশেক তেলেভাজা নিয়ে বসেছে বনিদাদা, চিঠিগুলো আমিই জোগাড় করে দিয়েছি ওকে। বনিদাদার কীর্তিকলাপ পড়ে নানা ধরনের চিঠি এসেছে আমার ই-মেলে; সেগুলোই ভাল পোস্টম্যানের মতো গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলাম দিন দুয়েক আগে, এর মধ্যে বনিদাদার চিঠি বেছে কিছু জবাবও দেওয়া হয়ে গেছে। যেগুলো বাকি রয়েছে, সেগুলো নিয়ে বসেছে আজ, বলা বাহুল্য মিঠিদিদি আর বুবুলও রয়েছে আড্ডায়।

"বুঝলি বুবুল, এবার দারুণ-দারুণ চিঠি পেয়েছি। আর পেয়েছি অনেক জায়গা থেকে। কলকাতা, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর, এমনকী জামশেদপুর থেকেও কয়েকজন লিখেছে," খোশমেজাজে মুড়ি খেতে-খেতে বলল বনিদাদা।

"ভাল চিঠি মানে তো নিশ্চয়ই তোমার ভুরি-ভুরি প্রশংসা করেছে। কী, ঠিক বলেছি না?" একটা গরম তেলেভাজা মুখে দিয়ে বলল মিঠিদিদি।

বনিদাদা একবার ঘুরেও দেখল না, নিজের মনে মুড়ি-তেলেভাজা খেয়ে যেতে লাগল।

"বুবুল, চুপ করে না থেকে জিজ্ঞেস করেই ফেল বনিদাদাকে, কী চিঠি এসেছে," বলল মিঠিদিদি। তারপর নিজেই সন্ধি করার ঢঙে বনিদাদাকে বলল, "এই নাও, আমিই করজোড়ে তোমার কাছে জানতে চাইছি তোমার অগুন্তি পাঠক-পাঠিকা তোমায় কী লিখেছে?"

"তুমি আমাকে এভাবে বলছ, জানো, আমাদের আড্ডার গল্প পড়ে সোমদেব শীল কী করেছে?" বনিদাদা প্রশ্ন করল।

"সে আবার কোথা থেকে উদয় হল?" জানতে চাইল মিঠিদিদি।

"কোথাও থেকে উদয় হয়নি। আমাদের আড্ডার গল্প পড়ে ও নিজের কলেজের জন্য একটা ওয়েবসাইট বানিয়ে ফেলেছে। আমাকে অ্যাড্রেসটা পাঠিয়েছিল। দিব্যি বানিয়েছে। তোমরাও দেখে নিতে পারো ST. JOSEPH'S COLLEGE-এর ওয়েবসাইট— সোমদেবের তৈরি করা। সেখানে যেতে গেলে তোমরা টাইপ করবে WWW.GEOCITIES.COM/SJCCAL/INDEX.HTML." গর্বের সঙ্গে বলল বনিদাদা।

"এটা তো বুঝলাম সোমদেবের চিঠি। তা এই একটা চিঠিতেই সব শেষ নাকি? আর কেউ ভাল কথা লেখেনি?" মিঠিদিদি ছাড়বার পাত্রী নয় বোঝা গেল।

"কে বলেছে আর কোনও চিঠি আসেনি? এই দ্যাখো বাঁকুড়া থেকে অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ই-মেল। অরিন্দম জানতে চেয়েছে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি নিয়ে ভাল ওয়েবসাইট কী কী আছে।" বনিদাদা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল।

"এটা কিন্তু খুব ভাল জিনিস জিজ্ঞেস করেছে। আমার কিন্তু পড়তে-পড়তে কোথাও আটকে গেলেই মনে হয় .... ইস, ইন্টারনেটে যদি কিছু পাওয়া যেত!

তা তুমি পেলে কিছু?" এই প্রথম মুখ খুলল বুবুল।

"হ্যাঁ রে। দারুণ কয়েকটা ওয়েবসাইটের সন্ধান পেয়েছি। অবশ্য অরিন্দম না বললে আমি জানতেও পারতাম না। যেমন ধর, ফিজিক্স সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য তুই পেয়ে যাবি WWW.AIP.ORG তে, এদের একটা দুর্দান্ত মিউজিয়াম সেকশন আছে, অতি অবশ্যই দেখবি সেটা। আর পড়াশোনাসংক্রান্ত সমস্ত জিনিসের জন্য চলে যাবি ওই ওয়েবসাইটের EDUCATION & STUDENT SERVICES অংশে।" বুঝিয়ে বলল বনিদাদা।

"আর কেমিস্ট্রি-র জন্য কোথায় যাব বনিদাদা?" পাছে বনিদাদা ভুলে যায় তাই কায়দা করে মনে করিয়ে দিল বুবুল।

"যদি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়তে চাস, তা হলে চলে যা WWW.CHEMISTRY COACH.COM/TUTORIALS-এ দারুণ সব লেখা পাবি এখানে। তা সে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিই হোক বা অর্গ্যানিক।" এক নিশ্বাসে বলল বুবুলের সবচেয়ে প্রিয় দাদা।

"ও হ্যাঁ, মিঠি এখানেই শেষ নয় কিন্তু, আরও চিঠি রয়েছে। এই ধরো, সম্রাট বসুর চিঠিটা।" সুযোগ বুঝে মিঠিদিদির খোঁচার জবাব দিয়ে দিল বনিদাদা। "সম্রাট জানতে চায় কোন-কোন সাইটে ভাল গেম্স পাওয়া যাবে।"

"জানো বনিদাদা, আমিও এটাই জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। গতকাল আমি একটা বেশ ভাল কম্পিউটার গেম্সের সাইট দেখলাম। WWW.INDIAGAMES.COM।" বুবুল বলে উঠল।

"হ্যাঁ, ওটা একটা বেশ ভাল সাইট করেছে। তা ছাড়াও অজস্র সাইট রয়েছে। WWW.MSN.COM বা WWW.YAHOO.COM-এ গিয়ে দেখবি ওদের আলাদা সেকশনই রয়েছে কম্পিউটার গেম্স নিয়ে। এখানে গেলেই তুই খেলতে পারবি প্রচুর গেম্স, খেলে আমাকে বলিস কোনটা ভাল লাগল।" বলে থামল বনিদাদা। তোমরাও বলো, মেল পাঠিয়ে CSAURAV@USA.NET-এ।

এমন ওয়েবসাইট আছে, যেখানে ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির পাঠ্য বিষয় নিয়ে নানা তথ্য জানা যায় সহজেই। তেমনই কিছু সাইটের খোঁজখবর এ-সংখ্যায়। লিখেছেন সৌরভ চক্রবর্তী

বিজ্ঞান

যেখানে যা হচ্ছে

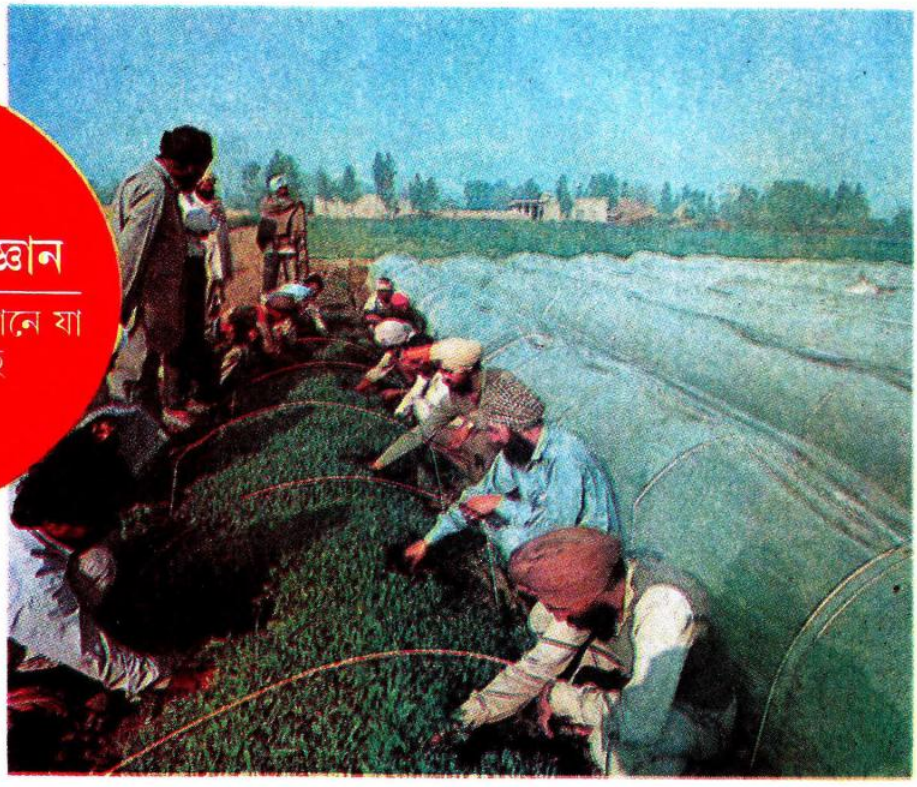

জৈব রাসায়নিক ওষুধ

আবহমান কাল থেকেই মানুষ গাছগাছড়ার ভেষজগুণকে কাজে লাগাচ্ছে। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মূলে রয়েছে শত সহস্র ভেষজ উদ্ভিদের আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসারও বহু কার্যকর ওষুধ তৈরি হয় গাছগাছড়া থেকে। সারা পৃথিবীতে অংসখ্য ভেষজ উদ্ভিদ আজও অনাবিষ্কৃত। বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলি পৃথিবীর নানা অঞ্চলে তার অনুসন্ধান চালাচ্ছে। পাশাপাশি জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে ভেষজ নয় এমন উদ্ভিদের মধ্যে নানা ধরনের ওষুধ তৈরির চেষ্টাও চলেছে। এ জাতীয় ওষুধকে বলা হয় 'বায়োকেমিক্যাল ড্রাগ' বা জৈব রাসায়নিক দাওয়াই। যেমন, ব্রিটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা তামাকের জিনগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মধ্যে এমন কিছু প্রোটিন সৃষ্টির চেষ্টা করছেন যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। শরীরের পক্ষে যা ক্ষতিকর, হয়তো তাই পরিণত হবে রোগনাশকে। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ৩৫০টি জৈব রাসায়নিক ওষুধ তৈরির জন্য গবেষণা চলছে, যার অধিকাংশই তৈরি হবে ভুট্টা, সয়াবিন এবং আরও নানা সাধারণ শস্য থেকে। তবে কৃষকরা যথেচ্ছভাবে তা সাধারণ খেতে ফলাতে পারবেন না। এজন্য চাই আগাগোড়া কাচে-ঢাকা গ্রিনহাউস, যেখানে নিয়ন্ত্রিত আর্দ্রতা ও উষ্ণতায় চাষ করতে হবে এইসব পরিবর্তিত উদ্ভিদের।

মিনি জুমার

আকারে মিনি, দিব্যি পকেটে নিয়ে ঘোরা যায়, অথচ আছে 'জুম লেন্স', টেলিস্কোপের মতো যা বেরিয়ে আসে আর খুব দূরের দৃশ্যও ধরে রাখে। কোথায়? ক্যামেরার ফিল্মে। 'মিনি জুমার' হল জুম-ব্যবস্থাসহ খুদে ক্যামেরা। 'ক্যানন,' 'মিনোল্টা,' 'নিকন' প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরা ক্যামেরা নির্মাতা সংস্থাই মিনি জুমার বের করেছে এবং সেগুলি বাজারেও চলছে। যেমন, ক্যানন-এর ভয়েস-২, মিনোল্টা-র ভেকটিস-২০০০ এবং নিকন-এর নুভিস-এস। এল্‌ফ-২ নামের ক্যামেরাটিই সবচেয়ে ছোট। লম্বায় ৩.৪ ইঞ্চি, চওড়ায় ২.২ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় মাত্র ০.৯ ইঞ্চি। এর দাম ২৪৯ ডলার। ভেকটিস-২০০০ মাপে ৪×২.১×১.২ ইঞ্চি। দাম একই। আর নুভিস-এস ক্যামেরার আয়তন ৩.৭×২.৬×১.৩ ইঞ্চি। দাম ২৭৯ ডলার।

এতই ছোট এইসব ক্যামেরা যে, ছবি তোলার সময় লেন্সের ওপর আঙুল পড়ে যেতে পারে, এমনকী,সামান্য অসতর্কতায় মাটিতে পড়েও যেতে পারে হাত ফসকে। সুতরাং ছবি-তুলিয়েরা সাবধান। বিশেষ করে খুদে ফোটোগ্রাফারদের তো সতর্ক থাকতেই হবে। ছবি তোলার আনন্দে এমন ক্যামেরা ভেঙে ফেললেই মুশকিল।

দূষণহীন গাড়ি

পেট্রোল ও ডিজেলচালিত গাড়ির বিষাক্ত ধোঁয়ার দূষণ শহরগুলোকে দিন দিনই বিপজ্জনক করে তুলছে। তাই গাড়ি চালাতে বিকল্প এবং দূষণহীন জ্বালানির উদ্ভাবন এবং ব্যবহারও শুরু হয়েছে নানা দেশে। এর একটি হল বিদ্যুৎশক্তি। বিদ্যুৎচালিত গাড়ি, বাস, অটো, টু-হুইলার এখন আর তেমন দুর্লভ নয়। কলকাতা শহরেই এমন দু-চারটে যাত্রীবাস এখন চলছে। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ জোগায় সাধারণত রাসায়নিক ব্যাটারি। আবার গাড়ির ছাদে সৌর কোষ প্যানেল বসিয়ে উৎপন্ন বিদ্যুৎ স্টোরেজ-সেলে সঞ্চয় করে তা দিয়েও চালানো হচ্ছে গাড়ি। তৃতীয় একটি পন্থা হল ফুয়েল-সেল বা জ্বালানি-কোষ। এই কোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎতে প্রথম গাড়ি চালানোর পরীক্ষায় সফল হয় বিখ্যাত মোটর নির্মাতা সংস্থা ডায়ামলার বেঞ্জ। প্রায় দেড়শো বছর আগে ইংরেজ পদার্থবিদ উইলিয়াম রবার্ট গ্রোভ জ্বালানি-কোষ উদ্ভাবন করেন। এর মূল উপাদান হল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এদের রাসায়নিক সংযোগ ঘটালেই তৈরি হয় জল এবং বিদ্যুৎ। জলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে তা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙে যায় বলেই, ওই দুই মৌলের সংযোগে যুক্ত হয় বিদ্যুৎ। দেড়শো বছরের পুরনো এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই বাজিমাত করেছে ডায়ামলার। গাড়িতে জ্বালানি-কোষ বলতে তারা বসিয়ে দিয়েছে দুটি তরল হাইড্রোজেন-ভরা ট্যাঙ্ক। বাইরে থেকে বাতাস টেনে নিয়ে তার অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিদ্যুৎ। একবার ট্যাঙ্ক ভরে নিলে ডায়ামলার বেঞ্জের ছয় যাত্রীবাহী মার্সিডিস গাড়ি চলে টানা ২৫০ কিলোমিটার। বর্জ্য হিসেবে তৈরি হয় শুধু জলীয় বাষ্প।

ভাস্কর

রোবট নিজেই তৈরি করছে ভবিষ্যতের রোবটদের নকশা

সত্যিই তাই। তেমন দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন ভবিষ্যতের রোবট দেখতে কেমন হবে তা ঠিক করবে বর্তমানের রোবটরা। জানিয়েছেন

সুব্রত রায়

রোবট নিয়ে মানুষের আগ্রহ কম নয়! কিছুদিন আগে মানুষের তৈরি রোবট-গাড়ি সোজর্নার মঙ্গল গ্রহের পিঠে ঘুরে বেড়িয়ে পৃথিবীতে অনেক রোমহর্ষক ছবি পাঠিয়েছিল। আর এক রোবট 'দান্তে' নেমেছিল আগ্নেয়গিরির গহ্বরে। কাজের সাহায্যের জন্য যন্ত্র তৈরির কল্পনা ও চাহিদা মানুষের বরাবরের। ভাগবত গীতায় বিশ্বকর্মা কৃত্রিম যন্ত্রাংশ দিয়ে অপরূপা তিলোত্তমা তৈরি করেছিলেন। দুর্গতি নাশ করার জন্য নানা দেবতার শক্তি ও অস্ত্র দিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার সৃষ্টি হয়েছিল। মিশরীয় পুরাণে আছে খ্রিস্টের জন্মের ১৪০০ বছর আগে দেবতা খ্নুম কাদার তাল দিয়ে মানুষ গড়েছিলেন। জলে স্থলে আকাশে কল্পনা ও বাস্তবে এমন রোবটের অবাধ বিচরণ। তবে রোবো যন্ত্রের সঙ্গে প্রাণীদের এতদিন বড় ফারাক ছিল। প্রাণীদের বিবর্তন আছে, যন্ত্রের নেই। মানুষের সংসার আছে, ছেলেমেয়ে ভাইবোন আছে, রোবটের তেমন সমাজবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা এতদিন ছিল না। সে ব্যবধান বিজ্ঞানীরা প্রায় ঘুচিয়ে ফেলেছেন।

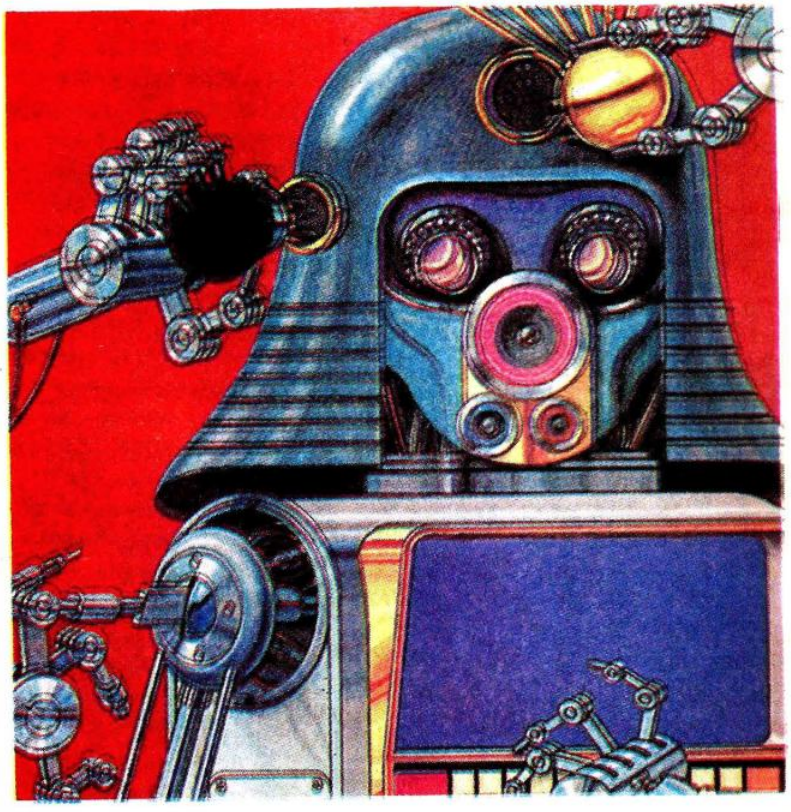

সম্প্রতি বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে ম্যাসাচুসেট্‌সের ব্র্যানডেস বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করেছেন, তাঁদের তৈরি রোবট নিজেরাই নিজেদের ভাবী প্রজন্ম ডিজাইন করতে পারে। জর্ডন বি পোলাক এবং হড লিপসন নামে এই দুই গবেষক সহজ কম্পিউটার প্রোগ্রাম দিয়ে রোবটের স্বনিয়ন্ত্রিত বিবর্তন সম্ভব করেছেন। শুরুতে ব্র্যানডেস রোবটটির আদৌ কোনও ধারণা ছিল না পরবর্তী প্রজন্ম দেখতে কেমন হবে। বিজ্ঞানীরাও জানতেন না। মাধ্যাকর্ষণ ও ঘর্ষণের প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে ২০০টি সম্ভাব্য যন্ত্রাংশ রোবটকে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের ব্যবহার করে ৩০০ থেকে ৬০০ রকম বিভিন্ন প্রজন্মের বিবর্তন ও খুঁটিনাটি পরিবর্তনের পর রোবট নিজেই তার সেরা নতুন প্রজন্মের নকশা করে ফেলে। সেই নকশা অনুযায়ী প্লাস্টিকের দণ্ড ও বল দিয়ে আট ইঞ্চি লম্বা প্রাথমিক পর্যায়ের খেলনা রোবট তৈরি করা গেছে। তারা মানুষের ডিজাইন করা নয়। মানুষের তৈরিও নয়।

নতুন আবিষ্কারের আগে বড়সড় একটা রোবট ডিজাইন করে তৈরিতে কয়েকশো হাজার থেকে বেশ কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ হত। পোলাকের মতে এমন ডিজাইন হবে নিখরচায়। রোবটেরা নিজেরাই তা করে ফেলবে। আর নতুন ডিজাইন অনুযায়ী রোবট তৈরিতে খরচও কম। মাত্র কয়েক হাজার ডলার। বা কয়েক লক্ষ ভারতীয় টাকা। পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন প্রাণীর বিবর্তনে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। তাদের চলাফেরার ধরন আলাদা। ব্র্যানডেসের রোবটের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথম ধাপের ২০০টি যন্ত্রাংশের নকশা কিছু বদল করলে রোবট ভিন্ন ধরনের যন্ত্রসন্তান সৃষ্টি করে। কখনও কাঁকড়ার মতো, কখনও পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়নের কায়দার নতুন প্রজন্মের রোবটগুলি চলাফেরা করে। পোলাক ও লিপসনের গবেষণার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ভবিষ্যতে রোবট সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাব্য কুফল হল মানুষ অতি বুদ্ধিমান যন্ত্রের দাস হয়ে থাকা। সান মাইক্রোসিস্টেমের প্রধান বিজ্ঞানী বিল জয় সম্প্রতি এমন গবেষণা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে এক প্রবন্ধে লিখেছেন, কিছু-কিছু বিষয় আমরা করতে পারলেও মানবকল্যাণে তা করা অনুচিত। যেমন, ডিডিটি ছড়িয়ে জীবাণু বিনাশ সম্ভব হলেও তাতে প্রাণীদের ক্ষতির আশঙ্কা। নতুন যন্ত্রমানব সৃষ্টি হতে আর বেশি দেরি নাও থাকতে পারে। ভিন্ন গ্রহে প্রাণের সন্ধানরত নাসা সেটি ইনস্টিটিউটের জ্যোতির্বিদ সেট সোস্টাক মনে করেন মাউনটেন ভিউ ক্যালিফোর্নিয়ার বেতার দূরবীক্ষণে হয়তো প্রথম প্রাণের সঙ্কেত পাঠাবে কোনও উন্নত গ্রহের যন্ত্রমানব। সেদিন মানুষের বিস্ময়ের সীমা থাকবে না।

‘লিট্‌ল প্রিন্স’বইটির অন্তত ১০০ কপি উপহার দিয়েছি ছোটদের

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

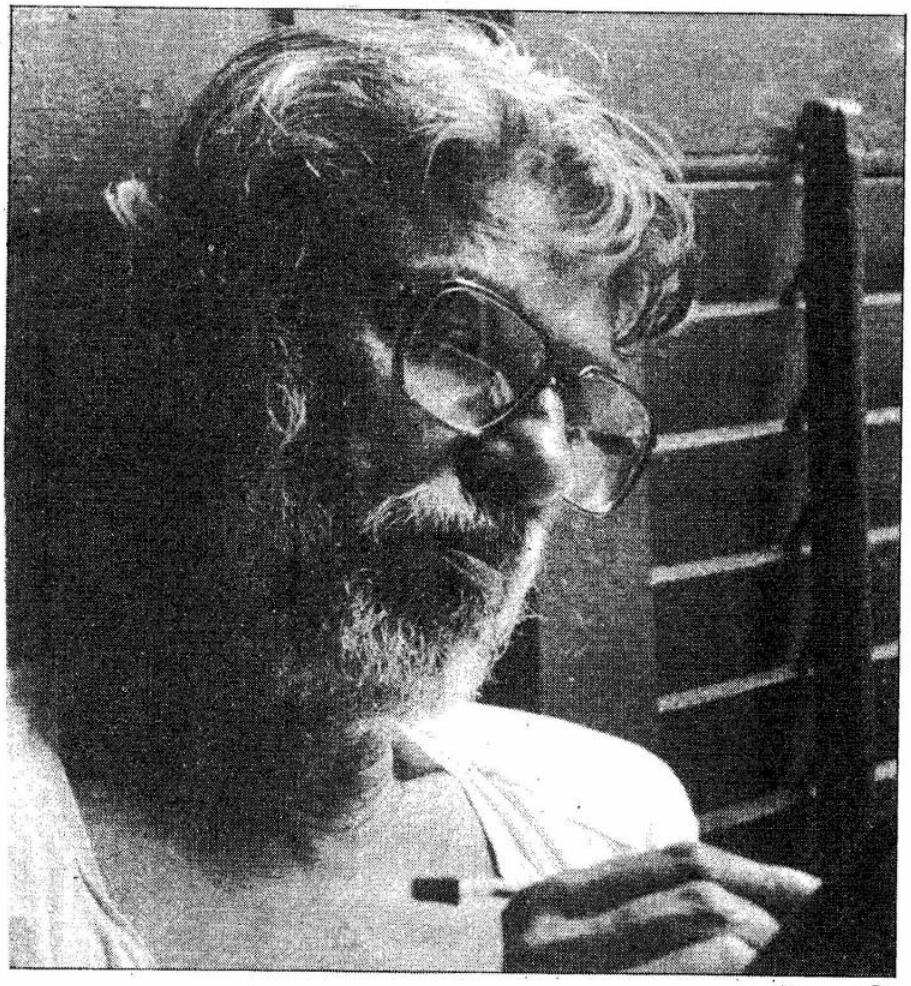

ফোটো : অলক মিত্র

ছেলেবেলায় একটা শৃঙ্খলের মধ্যে, একটা প্রথার মধ্য দিয়ে চললে লেখাপড়া থেকে শুরু করে সব কিছুতেই ধারাবাহিকতা আসে, যা আমি পাইনি। কারণ আমার ছেলেবেলা কেটেছে কঠোর দারিদ্র্যে। বাবাকে হারিয়েছি মাত্র ছ’ মাস বয়সে। আট ভাইবোনকে নিয়ে মা তখন বলতে গেলে দিশেহারা। সত্যি কথা বলতে কী, দশ বছর বয়সের মধ্যে আমি স্কুলে গিয়েছি মাত্র আড়াই বছর। এই সময়ে যা শিখেছি সবই ছাড়া-ছাড়া ভাবে। ফলে ছেলেবেলায় যেমন-তেমন ভাবে বেড়ে ওঠায় খারাপ যেটা হয়েছে, সেটা হল ‘মেকানিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনটা’ শিখিনি। সংস্কৃতে খুব ভাল ছিলাম। ভাল নম্বর পেতাম। কিন্তু ‘বেস’টা ভাল ছিল না। পরে ভেবেছি শিখব, কিন্তু আর শেখা হয়নি। ঠিক সেইরকম গানের বেলাতেও হয়েছে। গানের গলা ভাল, সুর আছে, ভাব আছে, কিন্তু তাল-লয়ের গন্ডগোল। আসলে যে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও রেওয়াজে ভাল গায়ক হতে পারতাম, সেটারই অভাব ছিল। ‘গোরা’ উপন্যাস লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ তিনবার পান্ডুলিপির রদবদল ঘটিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটিতে একটা নিখুঁত পরিপূর্ণতা আনার জন্যই এটা করেছিলেন। এই যে ‘ডেডিকেশন’, এটা যে কোনও ভাল কাজ করার জন্যই দরকার।

ছেলেবেলায় অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ার ভাল দিকটা হল, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই শেক্সপিয়র শেষ করে ফেলেছিলাম। আর বাড়িতে যত ভাল-ভাল বই ছিল সেগুলো পড়ে ফেলেছিলাম। তবে মজা হল, ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক বই পড়া হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের ‘ক্ষীরের পুতুল’, ‘বুড়ো আংলা’ পড়েছি বড় হয়ে। তবে বড় হয়ে পড়লেও শৈশবের আনন্দ কিন্তু বইগুলো থেকে পেয়েছি। এরিক ফ্রোমের ‘আর্ট অব লাভিং’, ‘ফিয়ার অব ফ্রিডম’, নমচমস্কির ভাষাতত্ত্বের ওপর লেখা বই, এরিক অব্‌স্বমের ‘এজ অব এক্সট্রিমস’, আঁতোয়ান দ্য স্যান্তেক্সুপেরির ‘লিট্‌ল প্রিন্স’— এই বইগুলো আমার ভীষণ প্রিয়। এইসব বই থেকে আমি মানুষকে দেখতে ও চিনতে শিখেছি। বিশেষ করে ‘লিট্‌ল প্রিন্স’ যেন অভিজ্ঞতার সোনার খনি। যতবার বইটা পড়েছি, কেঁদেছি। ‘লিট্‌ল প্রিন্সে’র ১০০ কপি আমি ছোটদের উপহার দিয়েছি। নমচমস্কির ভাষাতত্ত্বের বই পড়ে ক্রিয়া ও বিশেষ্যের ব্যবহারের যে কতখানি তারতম্য থাকতে পারে, বুঝেছি। আবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ পড়তেও আমার খুব ভাল লাগে। ইলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির একটা জার্নালে মানসমুকুল দাশের একটা লেখা বেরিয়েছিল মৃত্যুভাবনার ওপর। লেখাটা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। যে-কোনও ভাল জিনিসের মতো ভাল বইও মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। আমার বড় হয়ে ওঠার পেছনে যেমন রয়েছে আমার পরিবার, আমার পরিপার্শ্ব, তেমনই এইসব ভাল ভাল বই।

অনুলিখন : নূপুর চৌধুরী

সাদা কাকের ঝাঁক উড়ে বেড়াতে পারে বনের ভেতর

আসানসোলের ধর্মপল্লীতে ধরা পড়েছে একটি সাদা কাক। পক্ষিবিজ্ঞানীদের অভিমত, এই পাতিকাকটি আসলে 'অ্যালবিনো'। লিখেছেন রানা সেনগুপ্ত

খোদ সলিম আলির মতো পক্ষিবিশারদ বলেছেন, এমন ঘটনা লাখে একবার ঘটে কি না সন্দেহ। আর এই 'লাখো মে এক' সাদা কাকের বাচ্চা ধরা পড়েছে আসানসোলে। বনবিভাগের উষাগ্রাম রেঞ্জ অফিসে। যেখানে সাদা কাকের বাচ্চাটিকে রাখা হয়েছে, গড়ে ৫০০ মানুষ ভিড় করে দেখতে আসছেন প্রতিদিন। বলতে গেলে সাদা কাকের আকর্ষণে একটা মেলাই বসে গিয়েছে উষাগ্রামে।

এই ভিড়টাই হচ্ছিল আসানসোলের ধর্মপল্লীর বাসিন্দা, স্কুলশিক্ষক রত্নেশ্বর দত্তদের বাড়িতে। রত্নেশ্বরবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা এই সাদা কাকের বাচ্চাটিকে 'আবিষ্কার' করেন। অগস্ট মাসের একদিন, পাশের বাড়িতে সাদা মতো কী একটা উড়ে এসে পড়ল। পূর্ণিমা ভাবলেন, হয়তো পায়রার বাচ্চা! ওটাকে তিনি পাশের বাড়ির উঠোনে ধরার চেষ্টা করেন। সাদা বাচ্চাটা উড়ে উড়ে সামান্য দূরে সরে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমা ধরে ফেলেন ওটাকে। সঙ্গে সঙ্গে ওই পায়রা কি না কা-কা শব্দে ডেকে উঠল! প্রচন্ড অবাক হলেও তিনি হাতের মুঠো আলগা করেননি। বাড়িতে নিয়ে এসে ওই গোলাপি ঠোঁট আর পা, নীল চোখে লাল মণি, ধবধবে 'ক্রিম হোয়াইট' কাকের বাচ্চাকে দুধ পাউরুটি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখেন তিনি। তাঁর হেফাজত থেকে বনবিভাগের রেঞ্জ অফিসার সামসুল হক উষাগ্রাম অফিসে নিয়ে আসেন সাদা কাকটিকে। যাকে একবার চোখের দেখা দেখতে আসানসোল দুর্গাপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেই শুধু নয়, পাশের রাজ্যে বিহার থেকেও ট্রাক-বাস-টেম্পো ভাড়া করে মানুষের ঢল নেমেছে। সাদা কাকের বিশেষত্ব পরীক্ষা করতে আসছেন রাজ্যের পক্ষিবিজ্ঞানীরাও।

সাদা বা 'অ্যালবিনো' কাকের বাচ্চাটি আসলে 'হাউস ক্রো' অর্থাৎ পাতিকাক প্রজাতির। রাজ্যের বনপাল শ্যামলজ্যোতি বর্মন আপাতত ওটিকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বনবিভাগের অফিসারদের। উষাগ্রাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে গিয়ে দেখা গেল ৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা (২ ডানা ছড়িয়ে মাপ ৪৫ সেন্টিমিটার) এই সাদা পাতিকাকের ছানা মজা করে দুধভাত খাচ্ছে বনকর্মী হারুলাল শীর তত্ত্বাবধানে। তবে বেশিদিন নয়। সাদা কাকটি চলে যাবে বর্ধমানের রমনা বাগানে। সেখানে বন বিভাগের পক্ষিনিবাসে বড় খাঁচার মধ্যে রাখা হবে প্রকৃতিক এই বিস্ময় অ্যালবিনো পাতিকাক।

কিন্তু খাঁচায় কেন? অন্য কাকেদের দলে মিশে আরও সাদা কাকের জন্ম দিতে কেন ছেড়ে দেওয়া হবে না এই সাদা কাককে? দুর্গাপুরের বনাধিকারিক

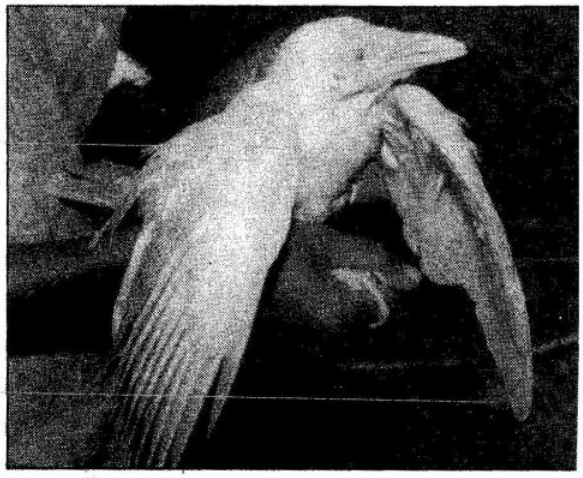

প্রভাতরঞ্জন চক্রবর্তী বললেন, "সাত বছর আগে উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিহাটিতে ধরা পড়েছিল সাদা কাক। সুস্থ করে তুলে ওটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর আর কাকটি বাঁচেনি। সম্ভবত অন্য কাকেদের আঁচড়, ঠোকরেই মারা যায়। এই সাদা কাক দেশের কোথাও নেই। তাই ওই দুর্লভ কাকটিকে খাঁচার ভেতর বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখতে চাই।" খুব শিগগির রাজ্যের পক্ষিবিশারদেরা কাকটিকে পরীক্ষা করবেন। তারপর রমনাবাগানে এই পাতিকাককে দিয়ে সাদা বাঘের মতো সাদা কাকের বংশধারা বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চালানোর ইচ্ছে আছে, ইঙ্গিত মিলেছে বনবিভাগ সূত্রে। এই বিষয়ে উৎসাহী জিন-বিজ্ঞানীর সন্ধানও চলছে বলে জানানো হয়েছে।

আর সাদা কাকের বংশধারা এই পাতিকাককে দিয়ে শুরু করানো এমন অসম্ভব কিছু নয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের প্রধান,বিশিষ্ট পরিবেশ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী সৌমেন মৈত্র অন্তত এ কথাই বলেছেন। সৌমেনবাবু জানান, কাক কালো, টিয়া সবুজ, এই স্বাভাবিক রং আসলে জিন-নিয়ন্ত্রিত। জিনের মধ্যে হঠাৎ প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটলে এই স্বাভাবিক রং বদলে যেতে পারে। কাকটির যে জিন কালো রং শরীরের পালকে তৈরি করা দরকার সেই জিন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া এবং তার ফলে 'মেলানিন পিগমেন্ট সিন্থেসিস' না ঘটায় এই কাক আসলে বর্ণহীন হয়ে জন্মেছে।

এই সাদা কাক স্ত্রী না পুরুষ, তা শনাক্ত করা এখনও সম্ভব হয়নি। সাদা বাঘের মতো এই সাদা কাকের বংশধারাও কিন্তু বাঁচিয়ে তোলা হয়তো সম্ভব হবে কোনওদিন। সৌমেনবাবু বললেন, "ঠিকমতো চেষ্টা চালালে দুর্লভ সাদা কাকের ঝাঁক উড়ে বেড়াতে পারে বর্ধমানের রমনাবাগানে।"

ফোটো : লেখক

চন্দ্রকেতুগড়ের নীচে এখনও রয়ে গেছে মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী

কলকাতার কাছেই উত্তর ২৪ পরগনার ছোট্ট এক মফঃস্বল শহর বেড়াচাঁপা। ওখানেই রাজা চন্দ্রকেতুর নামে আছে একটি গড়। মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। জানাচ্ছেন রাজীব চক্রবর্তী

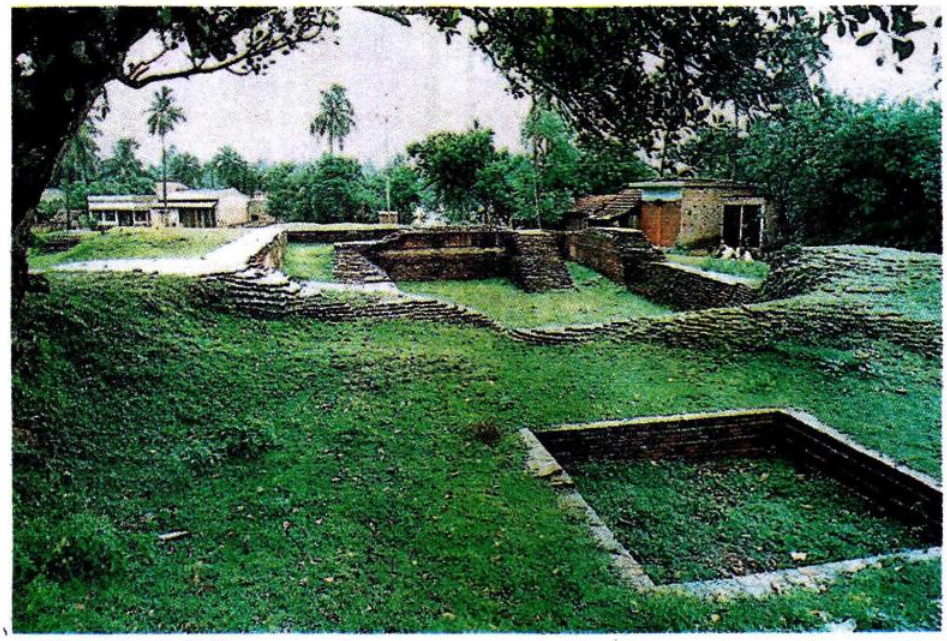

ফোটো : দেশকল্যান চৌধুরী

বেড়াচাঁপার এই জায়গাতেই খননকার্য চালান হয়েছিল

পোড়া মাটিতে নৃত্যরতা রমণী

আকাশের এক কোণে রয়েছে কালো সজল মেঘ। প্রথম কালবৈশাখীর দাপটে আগের দিন লণ্ডভণ্ড করে গেছে অনেক কিছুই। পড়ে আছে রাস্তায় বৃষ্টিধোয়া আহত গাছ, বিদ্যুতের ছেঁড়া তার। এরকম দিনে সেই জায়গায়, দেখে এলাম ঘুমিয়ে আছে মাটির নীচে প্রায় আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময়কার ইতিহাস। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত এবং সেন-পাল যুগের নানা ঐতিহ্য, কীর্তি।

চারদিকে মাটির বিশাল পাঁচিল, যা গড় বা দুর্গ। এখানের এই উঁচু মাটির ঢিপি যা এককালে ব্যবহৃত হত দুর্গ হিসেবে।

চন্দ্রকেতুগড়। উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপায়। রাজা চন্দ্রকেতু, শৈলেন্দ্র-বংশধর বা তার পরবর্তী কালের সময়কার। একসময় এখান দিয়ে বয়ে যেত পদ্মা। যার জলপথে চলত বাণিজ্যতরী, যেত ভিনদেশে। বেড়াচাঁপায় নোঙর করত বিদেশি বাণিজ্যতরী। অবশ্য পদ্মা আজ শুকিয়ে গেছে। আশ্চর্য এই, চন্দ্রকেতুগড় নাম হলেও ওই রাজার নামাঙ্কিত কোনও ফলক, পুঁথি বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু অসংখ্য লোককথা আজও মানুষের মুখে শোনা যায়।

ধর্মতলা থেকে মাত্র ঘণ্টা তিনেকের পথ। হাসনাবাদ, বসিরহাট, টাকি, হাড়োয়ার যে-কোনও সরকারি-বেসরকারি বাসে বেড়াচাঁপায় নেমে ভ্যান রিকশায় মিনিট কুড়ি-পঁচিশের পথ। শ্যামবাজার থেকেও আসা যায় ৭৯, ৭৯সি বাসে, বেড়াচাঁপায়। এখানে অবশ্য রাত্রিবাসের কোনও জায়গা নেই। তবে যাঁরা রাত্রে থাকতে চান, একটু দূরে বসিরহাটে সামান্য খরচে বিভিন্ন হোটেলে থাকতে পারেন।

চন্দ্রকেতুগড়ে এখনও খননকার্য চলছে। এখন যে অংশে খননকার্য চলছে তা সংশ্লিষ্ট এলাকার ২০ শতাংশ, ৮০ শতাংশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দখল করেছেন আঞ্চলিক মানুষেরা। প্রাচীন সভ্যতার সম্পূর্ণ নিদর্শন পেতে গেলে ওইসব অধিকৃত এলাকা খননকার্যের আওতাভুক্ত হওয়া দরকার— এ অভিমত আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, ভুবনেশ্বর শাখার উপ-অধিকর্তা পুরাতত্ত্ববিদ অশোক পটেলের। এখন পর্যন্ত যা সন্ধান পাওয়া গেছে তাতে শুধু এই গড় লম্বায় ২০০ কি.মি., চওড়ায় দেড় কি.মি. জানালেন অশোকবাবু।

এ অঞ্চলের ইতিহাস অতি প্রাচীন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্র। সে সময়েই অধুনা খুলনা, যশোহর, ২৪ পরগনা নিয়ে তৈরি হয়েছিল গঙ্গারিডি রাষ্ট্র, যার অন্য নাম গঙ্গা রাষ্ট্র। তার প্রধান নগর ছিল গঙ্গা বা গাঙ্গে। গঙ্গা বা গাঙ্গে ছিল বন্দর নগর। গ্রিস, রোমের ইতিহাসে লিখিত গঙ্গানগরীই হল আজকের দেগঙ্গা অর্থাৎ চন্দ্রকেতুগড়ই সেই গঙ্গানগরী। এখান থেকে পাওয়া বিভিন্ন জিনিস

পরীক্ষার পর এমনই অভিমত নানা প্রত্নবিজ্ঞানীর। ইতিহাস বলে, মহারাজ বলীর উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব সাগরের দ্বীপের রাজা হন সমুদ্র সেন। যাঁর রাজধানীর অংশ এই চন্দ্রকেতুগড় দ্বীপ।

১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে খননকাজ শুরু হয়েছিল। এর আগে স্থানীয় মানুষেরা পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পেয়েছিলেন নানা নিদর্শন। তখন থেকেই বিভিন্ন মহলে উৎসাহের শুরু। খননকাজের পর পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে জানা গেছে, মৌর্য যুগ থেকে শুরু করে শুঙ্গ, কুশাণ ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের মানুষদের বসবাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে অসংখ্য মাটির মূর্তি, পানপাত্র, থালা, প্রদীপ, কলসি, মাটির পাত্র, কালো পালিশের পাত্র যা শুঙ্গ মৌর্যযুগের সাক্ষ্য দেয়। বেশকিছু পাত্রের গায়ে রোম ও গ্রিসের ছাপ আছে, এই পাত্রগুলি, ওইসব দেশের সঙ্গে এদেশের ব্যবসার সাক্ষ্য দেয়।

পাওয়া গেছে ইটের তৈরি বিশাল বাড়ি, পয়প্রণালীর নিদর্শন, তক্ষশীলার মতো ডাস্টবিন, পাতকুয়া— সবই পোড়ামাটির। এ ছাড়াও পাওয়া গেছে ব্রাহ্মীলিপি খোদিত মূল্যবান সিল, তামা, রূপা (পুরাণ), স্বর্ণমুদ্রাও (দীনা)। এমনকী ভারতে স্বীকৃত প্রাচীনতম মুদ্রা 'সিলভার পাঞ্চ মার্ক কয়েন।' মিলেছে, দেবদেবী, রক্ষিণীসহ বিভিন্ন মূর্তি। প্রাপ্ত জিনিসের প্রদর্শন মিলবে স্থানীয় গবেষক দিলীপ মৈতে-র

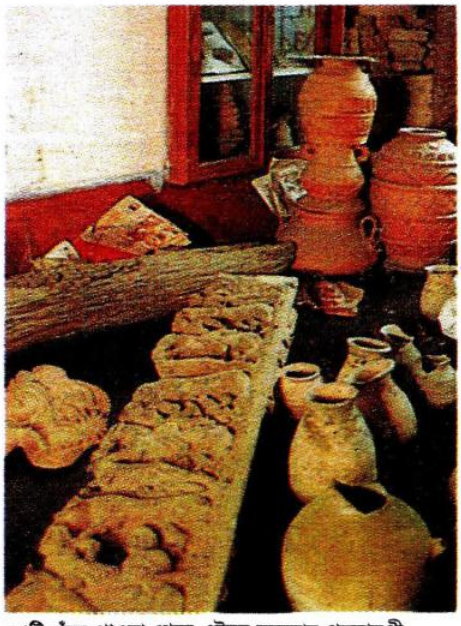

মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে এইসব মূল্যবান প্রত্নসামগ্রী

দর্শকদের জন্য

চন্দ্রকেতু সংগ্রহালয় দেখতে হলে রবিবারে এলেই ভাল হয়।
থাকতে চাইলে বসিরহাট রেজিস্ট্রি অফিস স্টপে নেমে, হোটেলের অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয়।
পিকনিক স্পট হিসাবে চন্দ্রকেতুগড় ভাল জায়গা।
সরাসরি বাস না পেলে চাটার্ড বাসে বারাসাত এসে লোকাল বাসে যাওয়া যেতে পারে।

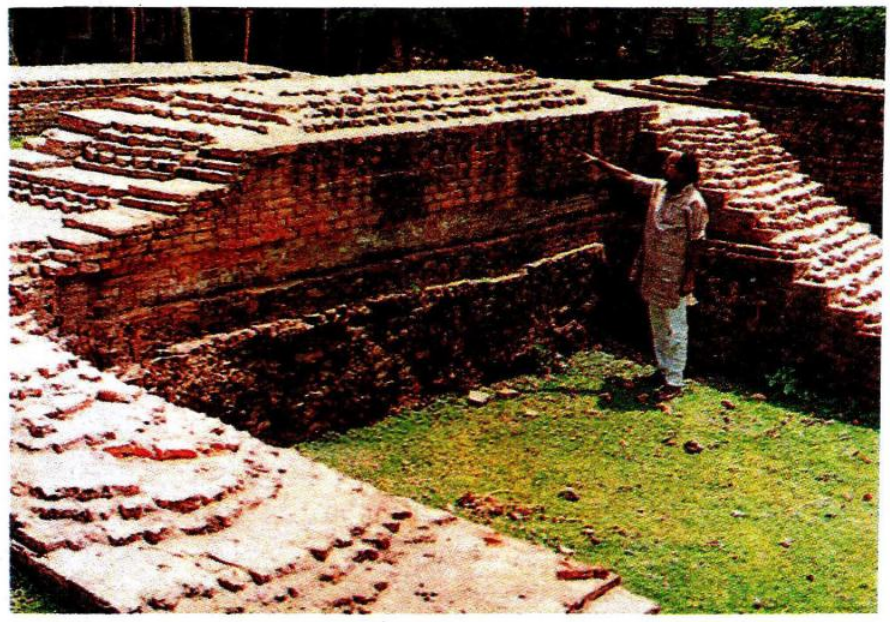

মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন

সংগ্রহশালায়, বাকিটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে। বেড়াচাঁপা স্টপের কাছেই দিলীপবাবুর বাড়ি এবং তাঁর সংগ্রহশালা। জানা গেল, সংগ্রহশালা দেখার জন্য কোনও পয়সা লাগে না। এখানেই দেখতে পাওয়া যাবে খ্রিঃপূঃ প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীর সভ্যতার নানা নিদর্শন।

১৯০৯ সালে চন্দ্রকেতুগড় দেখতে এসেছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লিখিত অভিমত, "স্থানটি ভারতবর্ষের অতিপুরাতন স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম।" বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় যেমন ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে, তেমনই এখানের খনা-মিহিরের ঢিপি হয়ে পড়েছে পর্যটকদের অন্যতম দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষী বরাহ। বরাহের পুত্র মিহির এবং খনা সিংহল রাজের কন্যা।

আবিষ্কৃত হয়েছে একটি মন্দির। যার দৈর্ঘ্য ৩০০ ফুট এবং প্রস্থ ১০০ ফুট। সেখানে আছে মণ্ডপ, যেখানে নৃত্যগীত, ধর্মালোচনা চলত বলে অনুমান। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল গুপ্ত রাজাদের আমলে। এই মন্দিরটির গঠনপ্রণালীর সঙ্গে সারনাথ, নালন্দার মন্দিরের বহু মিল পাওয়া যায়। এরই পাশে ছিল ২৩ ফুটেরও বেশি গভীর এক পাতকুয়া, যাতে সাঁইত্রিশটি ধাপ রয়েছে নীচের জলস্তরে পৌঁছনোর জন্য। পাওয়া গেছে চুনের ভাঁটা, তাতে প্রচুর শামুকের দেহাবশেষ। এ ছাড়া হাতির দাঁতের নানা সামগ্রী। জাহাজ, হাতি, ঘোড়া চিহ্নিত মুদ্রা। মন্দির ফলকে রত্নখচিত একটি পদ্মফুলের সন্ধানও মিলেছে। চলে গেছে খনা-মিহিরের যুগ, কিন্তু রয়ে গেছে যুগান্তকারী প্রবাদগুলি— 'যদি বর্ষে মাঘের শেষ/ ধন্য রাজার পুণ্যি দেশ' কিংবা 'মঙ্গলে উষা, বুধে পা/ যথা ইচ্ছা তথা যা।'

সেই রাজা নেই, তবে সেই রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ আছে মাটির গভীরে। এখনও পাওয়া যাবে নানা নিদর্শন। যে নিদর্শন হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস ও সময়কে করে তুলবে জীবন্ত।

ওলিম্পিকের

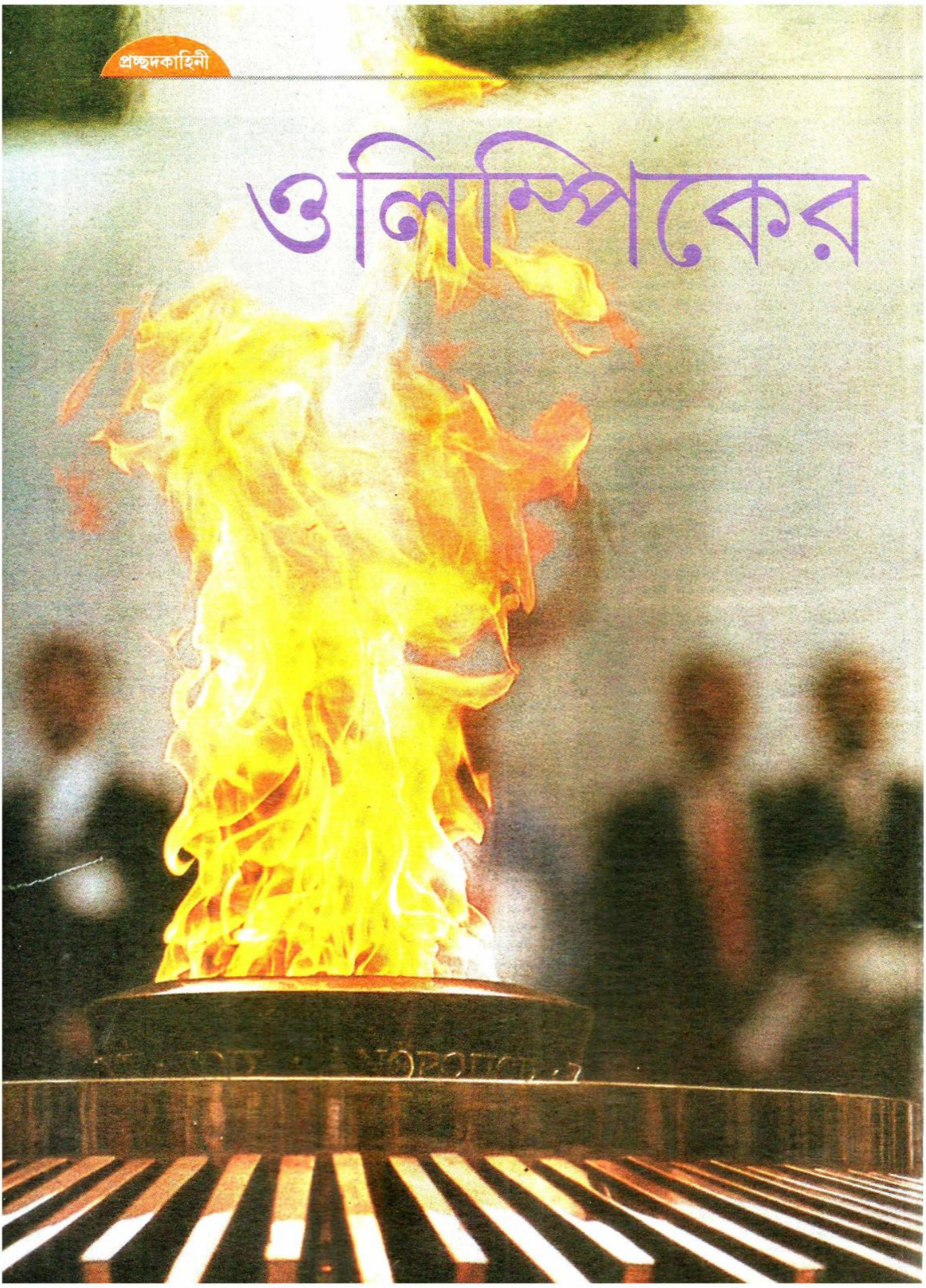

সেরা দশ

পৃথিবীর সবচেয়ে বর্ণোজ্জ্বল খেলার আসর ওলিম্পিক। শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছে আধুনিক ওলিম্পিকও। এই আধুনিক ওলিম্পিকের ইতিহাসে যে দশজন ক্রীড়াবিদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাঁদের পদকজয়ের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিয়েছেন তানাজি সেনগুপ্ত

বিশ্বের সেরা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ওলিম্পিকের বয়স কয়েক হাজার বছর। আধুনিক ওলিম্পিকও ১০০ বছরের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এই ১০০ বছরে এক লক্ষের বেশি ক্রীড়াবিদ ওলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। প্রত্যেক দেশের সেরা ক্রীড়াবিদরাই এই প্রতিযোগিতায় আসার সুযোগ পান। সে কারণে প্রত্যেক ওলিম্পিকেই নানা বিশ্বরেকর্ড ভেঙে যায়, তৈরি হয় নতুন রেকর্ড। অবিশ্বাস্য দক্ষতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওলিম্পিকের আঙিনা। প্রত্যেক ওলিম্পিক থেকেই বেরিয়ে আসেন বেশ কয়েকজন মহানায়ক। এঁরাই তৈরি করেন ওলিম্পিকের উজ্জ্বল ইতিহাস। এত ক্রীড়াবিদ, এত মহানায়ক— এঁদের মধ্যে থেকে ওলিম্পিকের সেরা ১০ ক্রীড়াবিদ বাছাই করা খুবই কঠিন। বিখ্যাত দৌড়বীর কিনিয়ার কিপ কিনো বলেছেন, "ওলিম্পিকের সেরা ১০ বাছাইয়ের চেয়ে নিজে ট্র্যাকে নেমে দৌড়ে পদক জেতা অনেক সহজ।" তাঁর মতে, "সর্বকালের সেরার তালিকায় আসতে হলে শুধু পদক জেতাটাই জরুরি নয়, সেই খেলোয়াড় ওলিম্পিককে, সেই খেলাকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছেন সেটাও দেখা জরুরি। একজন সেরা ওলিম্পিয়ান একজন চ্যাম্পিয়ানের চেয়েও বড়।" কিনোর এই যুক্তি যথার্থ। দক্ষতা, প্রভাব— এইসব মনে রেখেই তৈরি করা যেতে পারে ওলিম্পিকের সেরা ১০ খেলোয়াড়ের একটি তালিকা। আলোচনা করা যেতে পারে তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্বের। এই তালিকা নিয়ে অবশ্যই বিতর্ক উঠতে পারে। তাতেই বোঝা যাবে, ওলিম্পিকের জগৎ কত বড়, সেখানে রয়েছে কত খেলোয়াড়ের উজ্জ্বল কৃতিত্ব।

যে বাছাই ১০ খেলোয়াড়কে ওলিম্পিকের সেরা হিসেবে নেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন— পাভো নুর্মি, কার্ল লুইস, জেসি ওয়েন্স, এমিল জেটোপেক, মার্ক স্পিৎজ, ক্রিস্টিন ওটো, নাদিয়া কোমানিচি, অল আর্টার, ডন ফ্রেজার এবং গ্রেগ লুগানিস। পাভো নুর্মিই কি ওলিম্পিকের সেরা ক্রীড়াবিদ? কেন তাঁকেই সেরা বলা হচ্ছে? বাকিরাই বা কৃতিত্বে কতখানি উজ্জ্বল? এবার সেই আলোচনা।

গ্রেগ লুগানিস

গ্রেগরি এফথিয়স লুগ্যানসকে ১৯৬০ সালে মাত্র ন'মাস বয়সে দত্তক নেন পিটার এবং ফ্রান্সিস। আমেরিকার দম্পতি নাচ

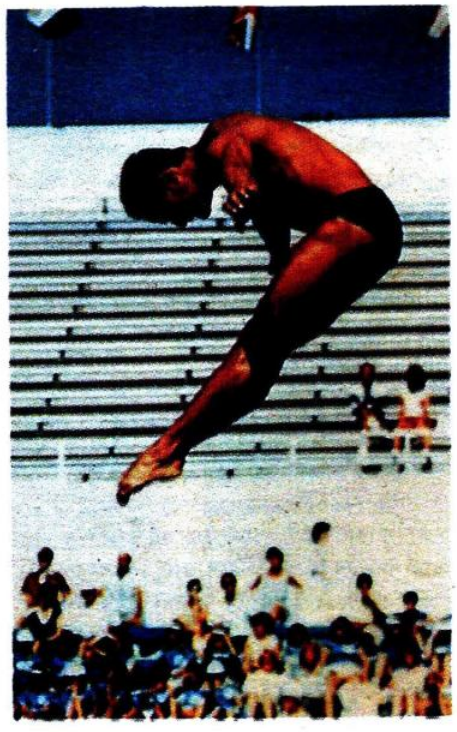

গ্রেগ লুগানিস

ভালবাসতেন, সেই ভালবাসা চলে আসে পুত্র লুগানিসের মধ্যে। মাত্র তিন বছর বয়স থেকেই নাচ তাঁর প্রিয়, পরবর্তীকালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্ল্যাসিক ব্যালেতে ডিগ্রিও পান লুগানিস। লুগানিসের আগ্রহ ছিল জিমন্যাসটিক্সেও। নাচ এবং জিমন্যাসটিক্স— এই দুই শিক্ষা তাঁকে পরবর্তীকালে সেরা ডাইভার হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট সাহায্য করেছে। প্রশস্ত বুক, বলিষ্ঠ উরু এবং লম্বা হাত দিয়ে পাঁচ ফুট ন'ইঞ্চি উচ্চতার শরীরটা যখন ওলিম্পিকের ডাইভিং বোর্ডে লাফাতে শুরু করত, তখন যে ছন্দশৈলী ফুটত— তা বিশ্বে দ্বিতীয় আর কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অদ্বিতীয় এই দক্ষতা বিস্মিত করেছিল সেই সময়ের আমেরিকার বিখ্যাত ডাইভার স্যামি লিকে। লুগানিসকে দেখে তিনি বলেন, "আমি জগতের সেরা ডাইভারকে দেখে ফেললাম।" যে প্রতিযোগিতায় তিনি লুগানিসকে দেখেন সেটি ছিল জুনিয়ার ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানশিপ। লুগানিসের বয়স তখন ১১, তার আগেই মাত্র ন'বছর বয়স থেকে তিনি বাড়ির পেছনের

পুলে ডাইভিং প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ডাইভিংয়ের ছন্দ, শিল্পে মেতে গিয়েছিলেন তিনি।

স্যামি লি লুগানিসকে কোচিং করাতে লাগলেন, মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৯৭৬-এর মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে ডাইভিংয়ে রুপোর পদক জিতে নিলেন। পরের চার বছর আমেরিকার যাবতীয় রেকর্ড চলে এল তাঁর দখলে। ১৯৮০-এর মস্কো ওলিম্পিকে স্প্রিং বোর্ড এবং প্ল্যাটফর্মে দুটি সোনা জয় যখন নিশ্চিত, সে সময়েই আমেরিকা বয়কট করল মস্কো ওলিম্পিক। ১৯৮৪-তে লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিক এবং পরের ১৯৮৮-তে সোলেও দুটি করে চারটি সোনা পাওয়া থেকে তাঁকে আটকাতে পারলেন না কেউই। পরপর দুটি ওলিম্পিকে দুটি বিভাগেই শ্রেষ্ঠত্ব কোনও ডাইভারই তাঁর আগে দেখাতে পারেননি।

১৯৮৮-এর পর অবসর নেন লুগানিস। ডাইভিংকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া লুগানিস পরবর্তীকালে দুর্দান্ত অভিনেতা হিসেবেও নাম করেন। বাবা-মা না-পাওয়া ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, ক্ষোভ সব তিনি শিল্পের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেছেন। ডাইভিং-এর ক্ষেত্রে লুগানিস অনন্য প্রতিভা হিসেবেই উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

ওলিম্পিক পদক : পাঁচটি। দুটি সোনা স্প্রিংবোর্ডে, দুটি সোনা এবং একটি রুপো প্ল্যাটফর্মে, ১৯৭৬, ১৯৮৪, ১৯৮৮-তে।

ডন ফ্রেজার

সিডনির দূরবর্তী এক ছোট্ট শহরে জন্ম ডন ফ্রেজারের। গরিব বাবা-মায়ের আট ছেলেমেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তিনি। ছেলেবেলাতেই স্কুলে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আর্থিক কারণে, কাজ নেন কারখানায়। পড়াশুনো ছাড়লেন, আঁকড়ে ধরলেন সাঁতারকে। ছেলেবেলা থেকেই জলে প্রবল আকর্ষণ। ভাল করে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য কারখানায় কাজের সময় বাড়িয়ে দিলেন, অতিরিক্ত অর্থে তাঁর সাঁতার স্কুলের মাইনে হয়ে যেত। ১৭ বছর বয়সে ফ্রেজার অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ জিতে নিলেন, ১৯ বছরে মেলবোর্ন ওলিম্পিকে তিনিই হয়ে উঠলেন জাতীয় নায়িকা। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে তিনি সোনা জিতলেন, বিশ্বরেকর্ডও ভেঙে দিলেন। ১৯৬০-এ রোম ওলিম্পিকে আবার সোনা।

১৯৬৪-এর টোকিও ওলিম্পিকে অংশ নেওয়ার জন্য ট্রেনিং নিতে যখন তিনি ব্যস্ত, সেই সময় তাঁর জীবনে নেমে এল ভয়ঙ্কর বিপর্যয়। গাড়ি চালিয়ে মাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, দুর্ঘটনায় পড়ল তাঁর গাড়ি। মা মারা গেলেন, আহত হলেন ফ্রেজার। অনিশ্চিত ওলিম্পিকে অংশ নেওয়া। পারিবারিক বিপর্যয় কিন্তু ভেঙে ফেলতে পারল না ফ্রেজারের লড়াকু মানসিকতাকে। সুস্থ হয়েই আবার অনুশীলন। টোকিওর পুলে জ্বলে উঠলেন ডন ফ্রেজার। আবার সোনা পেলেন। পর পর তিনটি ওলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে সোনা— ওলিম্পিকের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। পুরুষ বা মহিলা, কেউই এই রেকর্ড গড়তে পারেননি। অনন্য মানসিকতার অদম্য জয়, ওলিম্পিকে ডন ফ্রেজার এই কারণেই স্মরণীয়।

ডন ফ্রেজার

ওলিম্পিক পদক : আটটি। চারটি সোনা, চারটি রুপো। তিনটি সোনা ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে, একটি রুপো ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে, একটি সোনা এবং তিনটি রুপো রিলে সাঁতারে। ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪-তে।

আল অর্টার

যে ক'টি ওলিম্পিকে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, কোনওটিতেই ফেভারিট ছিলেন না আল অর্টার। এবং কোনওবারই বিশ্বরেকর্ড তাঁর দখলে ছিল না। তবুও প্রত্যেকবারই তিনি ওলিম্পিক রেকর্ড গড়েছেন এবং জিতেছেন। পরপর চারটি ওলিম্পিকে, ১৯৫৬-তে মেলবোর্নে, ১৯৬০-এ রোমে, ১৯৬৪-তে টোকিওতে এবং ১৯৬৮-তে মেক্সিকো সিটিতে তিনি সোনা জিতেছেন ডিস্কাস থ্রোয়ে। কোনও ডিস্কাস থ্রোয়ার ওলিম্পিকে টানা চারবার সোনা জিততে পারেননি। আগেও নয়, পরেও নয়। আল অর্টারই একমাত্র সেই রেকর্ডের দাবিদার। বলার কথা, প্রত্যেক ওলিম্পিকের আগে কোনও-না-কোনও আঘাতে আহত হবেন অর্টার, তবু সোনা জয়ে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলতে পারেনি কেউ। আমেরিকার এই সোনাজয়ী খেলোয়াড় যথার্থ অর্থেই ছিলেন ওলিম্পিয়ান। চাকরি করতেন নিউ ইয়র্কে, ম্যানেজারের পদে। ২৫ বছর কাজ করে ১৯৮৪-তে অবসর নেন। ওলিম্পিয়ান হিসেবে আলাদা কোনও সুযোগ জীবনে নেননি। বলেছেন, "যে সোনা পেয়েছি তা ভাঙানোর জন্য নয়, সযত্নে রেখে দেওয়ার জন্য।"

ওলিম্পিক পদক : চারটি সোনা। ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪, ১৯৬৮-তে ডিস্কাস থ্রোয়ে।

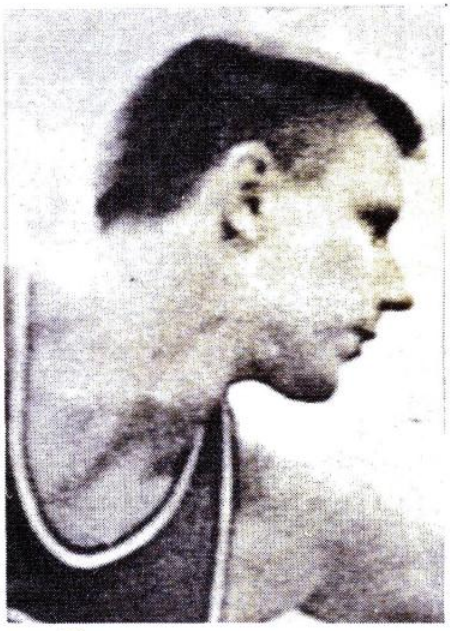

আল অর্টার

নাদিয়া কোমানিচি

১৯৭৬-এর মন্ট্রিয়ল ওলিম্পিকে একগুচ্ছ ফুলের মতো ছোট্ট রুমানিয়ান মেয়ে জিমন্যাসটিক্‌সে ম্যাজিক দেখান। সর্বাগ্রে ছিলেন ১৪ বছরের নাদিয়া কোমানিচি। দর্শকেরা অবাক চোখে দেখেন ১০-এর মধ্যে ১০ পেয়েছেন ওই ছোট্ট মেয়েটি বিম, ফ্লোরসহ মোট সাতটি বিভাগে। অনেকে ভেবেছিলেন, স্কোর বোর্ডে বোধ হয় ভুল লেখা হয়েছে। ভুল লেখা হয়নি, ওলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও জিমনাস্ট ১০-এ ১০ পেলেন। পাঁচটি সোনা প্রথম ওলিম্পিক থেকেই পেলেন নাদিয়া। ১৯৮০-এর ওলিম্পিকেও পদক পেয়ছিলেন নাদিয়া। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে নাদিয়া পেয়েছেন ২১টি সোনা, ওলিম্পিক এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপ থেকে। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই খেলা ছেড়ে দেন তিনি। জিমন্যাসটিক্‌সে অনেকেই সোনা পেয়েছেন, কিন্তু নাদিয়ার মতো শিল্পী খুব কমই এসেছেন।

ওলিম্পিক পদক : ন'টি। পাঁচটি সোনা, তিনটি রুপো; একটি ব্রোঞ্জ, ১৯৭৬ এবং ১৯৮০-তে।

নাদিয়া কোমানিচি

ক্রিস্টিন ওটো

পূর্ব জার্মানির সোনার মেয়ে ক্রিস্টিন ওটো সোল-সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠেন ১৯৮৮-এর ওলিম্পিকে। ছ'টি সোনা পান তিনি সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টে। কোনও মহিলা এর আগে ওলিম্পিকে এত সোনা জিততে পারেননি। ১৩ বছর বয়সে সাঁতার শিখে বিস্ময়কর প্রতিভা হিসেবে গণ্য হন ওটো। ইউরোপের প্রায় সব প্রতিযোগিতায় তিনি জেতেন। ১৯৮৪-এর ওলিম্পিক পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি বয়কট না করলে তিনি আরও সোনা পেতেন। ওটোর কৃতিত্ব তুলনাহীন এই কারণে যে, তিনি সাঁতারের বিভিন্ন বিভাগে, ফ্রিস্টাইল, ব্যাকস্ট্রোক এবং বাটারফ্লাইয়েই নিজের দক্ষতা দেখিয়েছেন। এরকম বহুমুখী প্রতিভা দেখাই যায় না। এইজন্যই তিনি 'সম্রাজ্ঞী' আখ্যা পেয়েছেন। পরবর্তীকালে পড়াশুনোতেও সাফল্য পেয়েছেন ক্রিস্টিন ওটো।

ওলিম্পিক পদক : ছ'টি সোনা। ১৯৮৮-তে।

ক্রিস্টিন ওটো

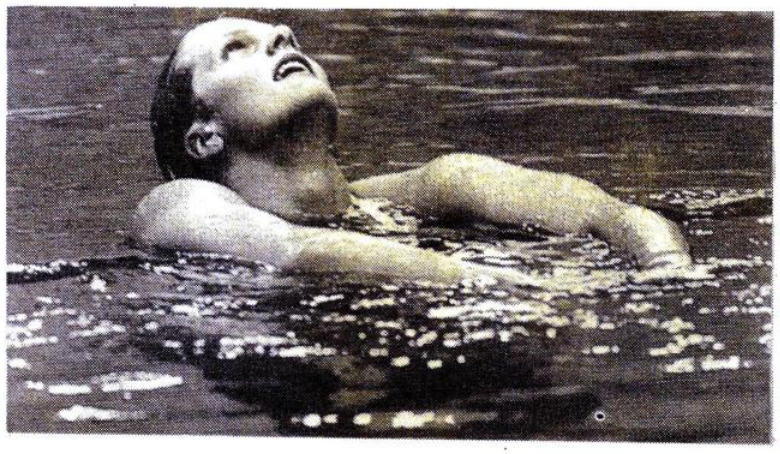

মার্ক স্পিত্‌জ

ওলিম্পিক থেকে দুটি সোনা পাওয়ার পরও খুশি নন দেশবাসী। এরকম ঘটনা একমাত্র একজনের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কারণ কী? তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী আশা করেছিলেন আরও অনেক স্বর্ণপদক। মার্ক স্পিত্‌জ সম্বন্ধে এই আশা অন্যায়ও ছিল না। ১১ বছর বয়সের আগেই সাঁতারে ১৭টি জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন আমেরিকার এই সোনার ছেলে। ফলে ১৯৬৮-তে মেক্সিকো ওলিম্পিকে যখন 'মাত্র' দুটি সোনা জিতলেন রিলেতে, হতাশ হলেন দেশের লোক।

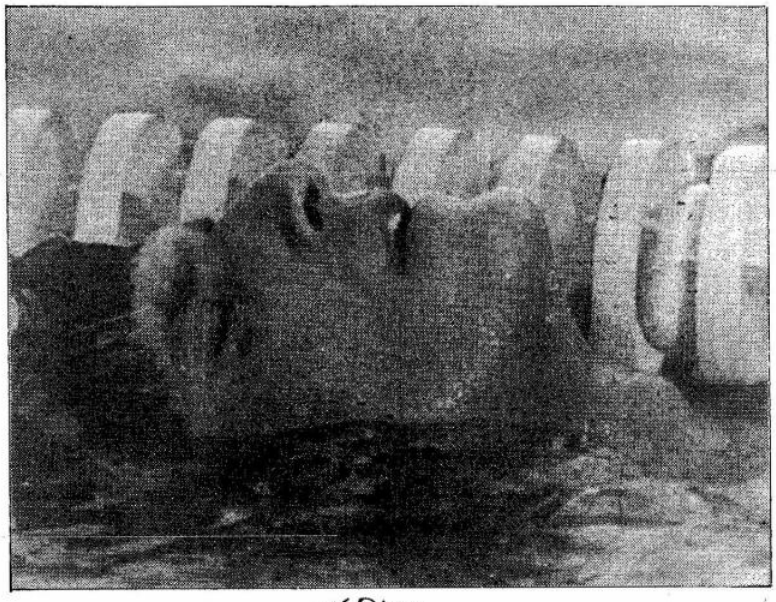

মার্ক স্পিত্জ

চার বছরের মধ্যেই এই হতাশাকে বিস্ময় ও উল্লাসে পরিণত করলেন মার্ক স্পিত্জ। ১৯৭২-এর মিউনিখ ওলিম্পিকের পুলে তিনি তুফান তুললেন। চারটি ব্যক্তিগত ও তিনটি দলগত, মোট সাতটি সোনা তিনি পেলেন এবং প্রত্যেকটিতেই নতুন বিশ্বরেকর্ড করে। কেউ কখনও ওলিম্পিকের একটি সাঁতারের আসরে এখনও পর্যন্ত এত সোনা জিততে পারেননি, বিশ্বরেকর্ডও গড়েননি। মার্ক স্পিত্জ 'সাঁতারের বিস্ময়' রয়ে গেলেন।

ওলিম্পিক পদক : ১০টি পদক। ন'টি সোনা, একটি রুপো। ১৯৬৮, ১৯৭২-এ।

এমিল জেটোপেক

এমিল জেটোপেক

'চেক এক্সপ্রেস' নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জেটোপেক এমন একটি রেকর্ডের অধিকারী, যা এখন পর্যন্ত অটুট আছে। পাঁচ হাজার মিটার, ১০ হাজার মিটার দৌড় এবং ম্যারাথন—এই তিনটিতেই ১৯৫২-এর হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে তিনি সোনা জেতেন। বলার মতো, এই প্রথম কোনও বড় ধরনের ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় যোগ দিলেন জেটোপেক। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রায় আড়াই মিনিটের ব্যবধানে পেছনে রেখে দিয়েছিলেন। পরে জেটোপেক অবশ্য বলেন, "ম্যারাথনে দৌড়নো আমার পছন্দ নয়, বিরক্তিকর দৌড়।" গরিব সূত্রধরের ছেলে এমিল আর্থিক কারণে ছেলেবেলায় রোজগারে নামেন। তার ফাঁকেই দৌড় অভ্যাস, তাও বন্ধুদের চাপে। অবশেষে মিলিটারি জীবনের শৃঙ্খলায় নিজেকে ক্রমশ বড় আসরের জন্য তৈরি করতে থাকেন। ১৯ বছরের আগে কোনও বড় প্রতিযোগিতায় নামেননি। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকে নামেন, দৌড়ে একটি সোনা জেতেন। তার পরের ১৯৫২-এর ওলিম্পিকে তো ঐতিহাসিক সাফল্য। ১৯৫২-তে এমিলের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ডানাও জ্যাভেলিনে সোনা পান। এক ওলিম্পিক থেকে একই পরিবারে চারটি সোনা—অসাধারণ রেকর্ড। এক সাফল্যের জন্য হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকের পর জেটোপেকের জন্মদিন জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন চেকোস্লোভাকিয়া সরকার। পরে অবশ্য সরকারের রোষে পড়েন তিনি, কিন্তু ততদিনে তাঁর স্থান হয়ে গিয়েছে জনগণের হৃদয়ে—অসাধারণ অ্যাথলিট এবং দৃঢ়চেতা মানুষ হিসেবে।

ওলিম্পিক পদক : চারটি সোনা। পাঁচ হাজার, ১০ হাজার মিটার দৌড় এবং ম্যারাথনে। ১৯৪৮, ১৯৫২-তে।

জেসি ওয়েন্স

জেসি ওয়েন্সের জন্ম ১৯১৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। ছেলেবেলা কেটেছে দারিদ্র্য এবং কষ্টের মধ্যে। বাবা-মা শিক্ষিত ছিলেন না। ফলে পড়াশুনোয় কোনও উৎসাহ দেখাননি কেউই। সারাদিন কাপড় কুড়িয়ে বেড়াতেন পুরো পরিবার। ওয়েন্সের যখন সাত বছর বয়স, তখন দিনে ৪৫ কেজি কাপড়ের টুকরো কুড়োতেন তিনি। তা দোকানে বিক্রি করে সামান্যই আয় হত। এই ছোট্ট শিশু-শ্রমিকটি ১৬ বছর পর সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে এনেছিলেন লড়াই করার অন্য মানসিকতা। দৌড়ের জগতে বিস্ময় হিসেব গণ্য হয়েছিলেন আমেরিকার জেমস ক্লিভল্যান্ড ওয়েন্স। ১৯৩৬-এর বার্লিন ওলিম্পিকে বিস্ময়ের ফুলঝুরি দেখিয়েছিলেন ওয়েন্স। ১০০ মিটার দৌড়লেন ১০.৩ সেকেন্ড, ২০০ মিটার ২০.৭ সেকেন্ড, লংজাম্প দিলেন ৮.০৬ মিটার এবং ৪×১০০ মিটার রিলেতে তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকান দল বিশ্বরেকর্ড গড়ল ৩৯.৮ সেকেন্ডে। একই ওলিম্পিকে চারটি সোনা। শ্বেতাঙ্গ কর্তারা তাঁর এই দক্ষতা পছন্দ করেননি। কিন্তু সাধারণ দর্শকরা মুগ্ধ

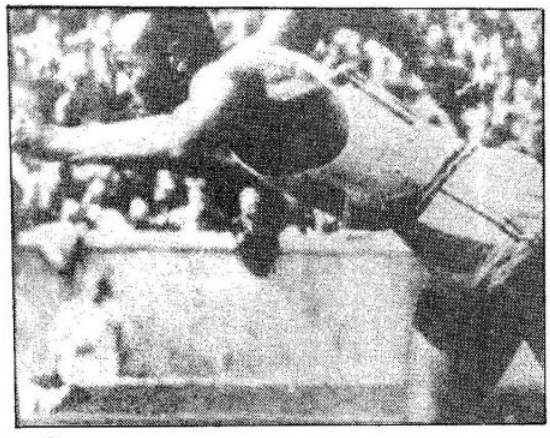

জেসি ওয়েন্স

হলেন, রাতেও ওলিম্পিক ভিলেজে তাঁরা উপস্থিত হতে থাকলেন ওয়েন্সের অটোগ্রাফ নিতে, তাঁকে একবার দেখতে। কৃষ্ণাঙ্গ বলে আমেরিকায় ফিরেও সেরকম পুরস্কার বা সংবর্ধনা পেলেন না ওয়েন্স। ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়ে দু' হাজার ডলার আয় করলেন তিনি। একজন ওলিম্পিয়ান একটা ঘোড়ার সঙ্গে দৌড়চ্ছেন? ওয়েন্স দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, "বাঁচার

জন্য অর্থ চাই, খাদ্য চাই, ওলিম্পিকের চারটি সোনা তো আর খাওয়া যায় না।" পরবর্তীকালে ওয়েন্স অবশ্য অর্থ পেয়েছিলেন, বছরে ২০০টি ভাষণ দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন। ১৯৮০-তে মারা যান ওয়েন্স। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন ওলিম্পিক জয়ের জন্যই নয়, কৃষ্ণাঙ্গদের লড়াইয়ের প্রতিভূ হিসেবে। যে-কোনও সংগ্রামী মানুষের প্রতিভূ হিসেবে।

ওলিম্পিক পদক : চারটি সোনা। ১০০, ২০০, ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড়, লংজাম্পে। ১৯৩৬-এ।

কার্ল লিউইস

সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলিট হিসেবে ওলিম্পিকের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন আমেরিকার কার্ল লিউইস। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৬— টানা ১২ বছর চারটি ওলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু নয়, চারটিতেই লংজাম্পে সোনা পেয়ে তিনি ছুঁয়েছেন আল অর্টারকে, ধরেছেন পাভো নুর্মির রেকর্ডও, ওলিম্পিক থেকে মোট ন'টি সোনা—এতদিনের ইতিহাসে এই দু'জনই মাত্র পেয়েছেন। ১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলিস ওলিম্পিকে যখন তিনি প্রথম অংশ নেন, কৃষ্ণাঙ্গ যুবক লিউইসের বয়স তখন ২৩। এবং প্রথম ওলিম্পিকেই তিনি নিজের দেশের অসাধারণ অ্যাথলিট জেসি ওয়েন্সের রেকর্ড স্পর্শ করেন। ওয়েন্সের মতো লিউইসও পেলেন চারটি সোনা : ১০০, ২০০ মিটার দৌড়, ৪×১০০ মিটার রিলে দৌড় এবং লংজাম্পে। এর মধ্যে রিলেতে বিশ্বরেকর্ড। ফলে ১৯৮৪ ওলিম্পিকের 'সুপারস্টার'-এর মর্যাদা তিনিই পান। ১৯৮৮-এর সোল ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে 'দ্রুততম পুরুষ' হয়ে তিনি শুধু সোনাই পাননি, বিশ্বরেকর্ডও গড়েন। লংজাম্পেও সোনা পান লিউইস। ১৯৯২-এর বার্সেলোনা ওলিম্পিকে লিউইসের প্রাপ্তি দুটি সোনা : লংজাম্প ও ৪×১০০ মিটার রিলেতে, রিলে দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড। শেষ তথা ১৯৯৬-এর আটলান্টা ওলিম্পিকে পেলেন নবম সোনা : লংজাম্পে। ন'টি সোনার মধ্যে কোন সোনাটির স্বাদ আলাদা? কার্ল লিউইসের সহাস্য মন্তব্য : "সবক'টাই আলাদা। এক-একটার স্বাদ এক-একরকম। তবে নবম সোনাটা পেতে সবচেয়ে বেশি মনঃসংযোগ করতে হয়েছে।"

অ্যাথলিটের জগতে ইতিহাস হয়ে যাওয়া কার্ল লিউইসের বাবা-মা দু'জনেই ছিলেন অ্যাথলেটিক্সের কোচ। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অ্যাথলিট ছিলেন কার্লই। ১৫ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর শরীর ও মনে পরিবর্তন আসে। ২০ বছর বয়সের মধ্যে ১০০ মিটার দৌড় ও লংজাম্পে তিনি বিশ্বে এক নম্বর হন। ১৯৮৭ সালে তাঁর বাবা যখন ক্যান্সারে মারা যান, তখন কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কফিনের ওপর একটি সোনার পদক রাখেন কার্ল, বাবার গর্ব ছিল ছেলের সোনা নিয়ে। বিস্মিত হয়ে যান মা, কার্ল তখন মাকে আশ্বস্ত করেন, "ভেবো না মা, আমি আবার সোনা জিতব।" কার্ল লিউইস শুধু কথা রাখেননি, দৌড় এবং লংজাম্পে নানা বিস্ময়কর ফল করে তরুণ প্রজন্মের কাছে আদর্শ হয়ে আছেন, দুর্দান্ত ওলিম্পিয়ান হিসেবে নিজের নাম রেখে গেছেন।

ওলিম্পিক পদক : ১০টি। ন'টি সোনা, একটি রুপো। ১০০ মিটার দৌড়ে দুটি সোনা, একটি সোনা একটি রুপো ২০০ মিটার দৌড়ে, লংজাম্পে চারটি সোনা, দুটি সোনা ৪×১০০ মিটার রিলেতে। ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৬-এ।

পাভো নুর্মি

হেলসিঙ্কি শহর থেকে ১০০ মাইল পূর্বে, তুর্কু নামে ছোট্ট শহরে জন্ম পাভো নুর্মির, বাবা ছিলেন সূত্রধর, নুর্মির বয়স যখন ১২, তিনি মারা যান। পাঁচ সন্তানের মধ্যে বড় নুর্মির ওপরই পড়ে অনটনের সংসার চালানোর চাপ। স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন, অর্থ রোজগারে নেমে পড়েন। একমাত্র শখ ছিল দৌড়নো, শহর-ঘেরা পাইনবনের মাঝের রাস্তায় শুধু ছুটতেন। তাঁর এই ছোটার স্বভাব এতই স্বাভাবিক ছিল যে, ১৯৯৯ সালে যখন মিলিটারিতে কাজ করা বাধ্যতামূলক হল, ২০ কিলোমিটার মার্চ করতে হত সবাইকে, কাঁধে থাকত রাইফেল, পাঁচ কেজি ভারী বালির বস্তাও, সবাই ধুঁকতে-ধুঁকতে হাঁটত আর পাভো নুর্মি ওইসব নিয়ে দৌড়তেন, লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যেতেন সবার আগে। তাঁর নামে এমন অভিযোগও করা হত যে, তিনি পথ 'শর্টকাট' করেছেন। অন্যায়ের আশ্রয় নিয়েছেন। এই সব অভিযোগেরই জবাব মিলল ১৯২০ সালের অ্যান্টোয়ার্প ওলিম্পিকে, নুর্মির বয়স তখন ২৩, তিনটি সোনা পেলেন তিনি, ১০ হাজার মিটার ওলিম্পিকে নুর্মির প্রতিভা বিচ্ছুরিত হল আরও ইভেন্টে— ১৫০০ মিটার, পাঁচ হাজার মিটার দৌড়, একটি টিম রেস (যেটি এখন আর হয় না) এবং দুটি ক্রস কান্ট্রি রেসে, মোট পাঁচটি সোনা। ওলিম্পিকে অবিস্মরণীয় কীর্তি। ১৯২৮-এর ওলিম্পিকে আরও একটি সোনা যুক্ত করলেন, ১০ হাজার মিটার দৌড়ে। মোট ন'টি সোনা তিনটি ওলিম্পিকে। দশটি মরসুমে নুর্মি যে ক'টি ইভেন্টে নেমেছেন সবক'টিতেই বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন —এক মাইল, দু' মাইল, তিন মাইল, চার মাইল, পাঁচ মাইল, ছ' মাইল, ১৫০০ মিটার, ২০০০ মিটার, ৩০০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার এবং ২০,০০০ মিটার দৌড়ে। এরকম দক্ষতা বিশ্বে কোনও খেলায় আর কোনও খেলোয়াড় দেখাতে পারেননি। অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে দেওয়ার পর খুব নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন নুর্মি, একা-একা। দৌড়কেই ভালবেসেছিলেন আর কিছুকেই পছন্দ করতে পারেননি। জীবনের শেষদিকে অবশ্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের ভক্ত হয়ে পড়েন। মাঝারি এবং দূরপাল্লার এই অসাধারণ দৌড়বীরের স্মরণে হেলসিঙ্কি স্টেডিয়ামের বাইরে তৈরি হয়েছিল একটি ব্রোঞ্জমূর্তি। নুর্মি অবশ্য এসবের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন। খেলাই ছিল তাঁর কাছে সব। ওলিম্পিকের দক্ষতা, আদর্শের তিনিই ছিলেন যথার্থ প্রতীক। এই কারণেই অনেক বড়-বড় খেলোয়াড় এলেও ওলিম্পিকে নিঃসন্দেহে সেরাদের মধ্যে সেরা ফিনল্যান্ডের পাভো নুর্মি।

ওলিম্পিক পদক : ১২টি। ন'টি সোনা, তিনটি রুপো। ১৫০০ মিটার, ৫০০০ মিটার, ১০,০০০ মিটার দৌড়, ক্রস কান্ট্রি রেস, স্টিপল চেজ এবং রিলে দৌড়ে। ১৯২০, ১৯২৪ এবং ১৯২৮-এ।

কার্ল লিউইস

পাভো নুর্মি

এবার ওলিম্পিক পদকেও নতুনত্ব

ওলিম্পিক-বিজয়ীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি হয় পদক, পদকের নকশা। বৈচিত্র্যে অভিনব এই পদকের কথা লিখেছেন শান্তনু ঘোষ ও বিশ্বপ্রিয় নন্দী

প্রাচীন ওলিম্পিকে পুরস্কার ছিল জলপাই পাতার মুকুট। সঙ্গে ওই পাতারই স্তবক। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজারাজড়ার তরফেও থাকত নানা বহুমূল্য পুরস্কার। জমি, বাড়ি, অলঙ্কার, রত্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল ওই জলপাই পাতার মুকুটই।

সেই ঐতিহ্যের কথা মনে রেখেই আজও ওলিম্পিকে জয়ীদের দেওয়া হয় জলপাই পাতার মুকুট। সঙ্গে পদক। সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ। ১৮৯৬ সালে আথেন্সে শুরু হয় আধুনিক ওলিম্পিক। তখন থেকেই পদক দেওয়ার রীতি চালু হয়।

আথেন্সের পর বিশ্বের বিভিন্ন শহরে প্রতি চার বছর অন্তর হয় ওলিম্পিক। লন্ডন, প্যারিস, মেলবোর্ন, হেলসিঙ্কি, আটলান্টা, সিডনি। যখন যে শহরে ওলিম্পিক আয়োজিত হয়, সেখানকার সংগঠকরা নিজেদের দেশ ও এই আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ঐতিহ্য মাথায় রেখে তৈরি করেন পদকের নকশা। এবার সিডনিতেও করা হয়েছে পদকের নতুন নকশা।

পদকের নকশার জন্য এবার আয়োজন করা হয়েছিল একটি প্রতিযোগিতার। অংশ নিয়েছিলেন বেশ কয়েকশো শিল্পী। এর মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয় পোল্যান্ড থেকে ১৫ বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় চলে আসা শিল্পী উজকিরেচ জিয়েত্রানিক-এর নকশাটিকেই।

পদকের সামনের পিঠে বসে আছেন জয়ের দেবী 'নাইক'। মাথায় জয়ের মুকুট, হাতে একগুচ্ছ পাম পাতা। দেবীমূর্তির নীচে

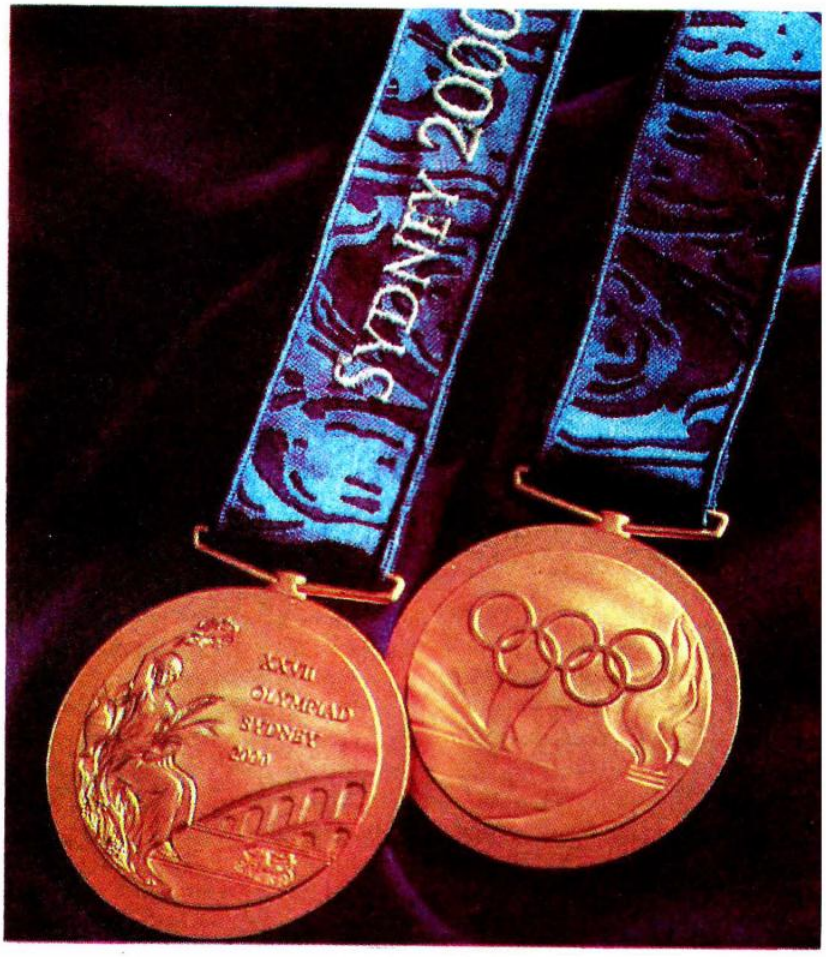

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ফুল ওয়াট্‌ল। পুরো ছবিটির পশ্চাৎপটে আছে প্রাচীন আথেন্সের কলোসিয়াম ও ঘোড়ায় **টানা** জয়রথ। উলটো পিঠে খোদিত বিখ্যাত সিডনি অপেরা হাউস। সঙ্গে ওলিম্পিক মশাল ও পঞ্চবলয়।

গেমসের জন্য তৈরি হয়েছে ১০০০টি স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক। ব্রোঞ্জ মেডেল ১১০০। তবে সোকজের ধারণা, পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে এর মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ। বাকিগুলি নষ্ট করে ফেলা হবে।

এদিকে যিনি নকশা তৈরি করেছেন, সেই জিয়েত্রানিক বলেছেন, "সিডনি, অস্ট্রেলিয়া এবং সর্বোপরি ওলিম্পিকের কথা মাথায় রেখেই নকশা করেছি। পুরস্কার হিসেবে যখন প্রথম পদকটি দেওয়া হবে তখন আনন্দে কেঁদে ফেলব। যাঁরা পদক জিতবেন তাঁরা অস্ট্রেলিয়াকে মনে রাখবেন, ভালও বাসবেন।"

অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণপদক জয়ী স্যান্তা নর্ম্যানি পদক দেখে অভিভূত। বলেছেন, "ক্রীড়াবিদরা মেডেলগুলি দেখে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন।"

মাত্র কয়েকজনের গলাতেই ঝুলবে পদক। এরই জন্য লড়ছেন কয়েক হাজার ক্রীড়াবিদ। প্রাচীনকালের মতোই পদক জিতলে ক্রীড়াবিদরা সরকারি ও বেসরকারি তরফে পাবেন অজস্র উপহার ও অর্থ। তবু সেদিনের মতোই আজও শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও মূল্য থকবে ওই পদকেরই।

সরস্বতীর লক্ষ্য এখন সিডনি

ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে সরস্বতী দে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে চান। সিডনি ওলিম্পিকে ছাপিয়ে যেতে চান নিজেকে। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সফল অ্যাথলিট সরস্বতী সম্পর্কে জানিয়েছেন সুজন ঠাকুরতা

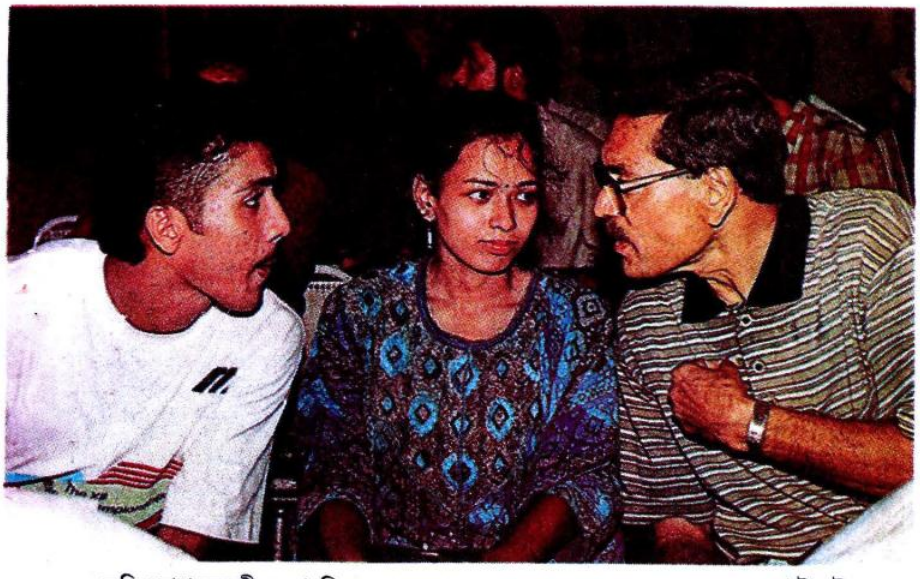

অমিত সাহা সরস্বতী দে ডানদিকে কোচ মনোরঞ্জন পোড়েল ফোটো : উত্তম রায়

তারিখ ২৯ অগস্ট, বুধবার। সন্ধেবেলা জাকর্তা থেকে ফোন আসে হুগলির কাপাসডাঙায় অমিত সাহার বাড়িতে। প্রিয় বন্ধু, প্রেরণা স্বামীকে ফোনে জানান সরস্বতী তিনি এশিয়ান ট্র্যাক ও ফিল্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে রুপো জিতেছেন। সরস্বতীর এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর শুনে অমিত ভুলে গিয়েছেন এ.টি.এফ মিট থেকে নিজের বাদ পড়ার দুঃখ। পরে সরস্বতী ফোন করেন তাঁর কোচ সুনির্মল ঘোষকে। হুগলির সাহাগঞ্জে নিজের বাড়িতে বসে সুনির্মল বললেন, "জানতাম ও একদিন ভাল ফল করবেই। এই মুহূর্তে ওর মতো স্প্রিন্টার ভারতে নেই। কিছু কিছু সময় ওর পা এত দ্রুত পড়ে যে, নিজেও অবাক হয়ে যাই। ওলিম্পিকে শুধু রিলেতে না, ১০০ মিটার দৌড়েও ওকে সুযোগ দেওয়া উচিত।" সত্যি, এশীয় ট্র্যাক ও ফিল্ডে রুপো জিতে সরস্বতী চমকে দিয়েছেন সকলকে। প্রমাণ করেছেন, প্রতিভা থাকলে তাঁকে বেশিদিন আটকে রাখা যায় না। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে, সতীর্থ ও দেশের এক নম্বর স্প্রিন্টার রচিতা মিস্ত্রিকে পেছনে ফেলে জীবনের সেরা সময় করে (১১.৪০ সেকেন্ড) জাকর্তায় ১০০ মিটারে রুপো জিতলেন সরস্বতী দে। এই ইভেন্টে সোনা পান উজবেকিস্তানের লুবফ পেরেপলোভা, আর ব্রোঞ্জ রচিতা মিস্ত্রি (১১.৪৬ সেকেন্ডে) এশীয় পর্যায়ে সাফল্য পাওয়ার পর সরস্বতীর লক্ষ্য সিডনি। সিডনি ওলিম্পিকে নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চান তিনি। চান আরও ভাল ফল করতে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন বাংলার গর্ব সরস্বতী দে।

সংগ্রামই সরস্বতীর জীবনের মূলমন্ত্র। সরস্বতীর জীবনে বহু বাধা এসেছে, প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা বারেবারে পেছনে ফেলে দিতে চেয়েছে তাঁকে, কিন্তু কোনও কিছুতেই হার মানতে চাননি। মনের জোর, জেদ, কিংবা সংকল্প ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সবকিছুকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন, তাই আজ তাঁর এত সাফল্য। গতবছর চোটের কারণে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স মিট থেকে বাদ পড়েছিলেন, এখন দেশের অন্যতম সফল অ্যাথলিট। কিন্তু ওই ঘটনার কথা ভেবে দুঃখ না পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। শুধু এই নয়, এ-বছর সরস্বতী-অমিতের বিয়েকে কেন্দ্র করে রীতিমত হইচই হয়েছিল। শিবির থেকে পালিয়ে এসে বিয়ে করেছেন দু'জনে বলে রটে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় হুগলিতে শ্বশুরবাড়িতে বসে সরস্বতী জানিয়েছিলেন, "সব মিথ্যা, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা চক্রান্ত হচ্ছে, যেরকম হয়েছিল আগে জ্যোতিদির বিরুদ্ধে। আমি ও অমিত দু'জনে চিঠি দিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই বিয়ে করতে এসেছি।" বিয়ের পরে আবার জাতীয় ক্যাম্পে ফিরে গেছেন, কোনও সমস্যা হয়নি। বিদেশি (রুশ) কোচ, ডাক্তার, সুনির্মল ঘোষের প্রশিক্ষণে ধীরে ধীরে চোট (গোড়ালি ও হ্যামস্ট্রিংয়ের) আঘাত সারিয়ে আবার ট্র্যাকে ফিরে আসেন অ্যাথলিট সরস্বতী দে। হুগলিতে অনুশীলন করেন সাহাগঞ্জে। গত বছর দেশে পাঁচ-পাঁচটি মিটে চ্যাম্পিয়ান হওয়া সরস্বতী জানিয়েছেন, তাঁর লক্ষ্য দেশের এক নম্বর স্প্রিন্টার হওয়া এবং ভারতের নাম আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উজ্জ্বল করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন ছোটখাটো চেহারার লড়াকু মেয়ে সরস্বতী দে। গত বছর বাঙালেরে পি.টি. উষাকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন তিনি সকলকে, সেই চমক এখনও অব্যাহত।

দরিদ্র কৃষক পরিবারের মেয়ে সরস্বতী। বাড়ি ত্রিপুরায়। ছ'বোন, এক ভাই সরস্বতীরা। সরস্বতী ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলায় চলে আসেন ১০-১২ বছর বয়সে (সাই ক্যাম্পে)। তখন থেকে কলকাতায়। এখন ঠিকানা হুগলি। বয়স ২০-২১, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, ওজন ৪৬ কেজি। প্রিয় খাবার ডিম ও মাখন। সৌরভের অনুরাগী সরস্বতী কিশোরকুমারের গান ও অমিতাভ বচ্চনের অভিনয় দেখতে পছন্দ করেন। ত্রিপুরার বিলোনিয়া গ্রামের মেয়ে সরস্বতী এখন চাকরি করেন পূর্ব রেলে। প্রিয় অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার, বিদেশে ফ্লোরেন্স গ্রিফিথ জয়নার ও মারিয়ান জোন্স। ১৯৯৬ এবং '৯৭ সালে জুনিয়ার ট্র্যাক মিট থেকে সরস্বতীর উত্থান, তারপর শুধুই এগিয়ে যাওয়া। জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে ক্যাম্পে। '৯৬ সাল থেকে জুনিয়ার পর্যায়ে সোনা জিততে শুরু করা সরস্বতী পরবর্তীকালে সিনিয়ার স্তরেও ফেডারেশন কাপ ও সোনা জেতেন। বাড়িতে মেডেলের ছড়াছড়ি। তবে লড়াকু, সংগ্রামী সরস্বতীর লক্ষ্য এখন সিডনি ওলিম্পিকে ভাল সময় করা। বাবা শক্তিরঞ্জন দে'র প্রবল উৎসাহ পেয়েছেন তিনি। ওলিম্পিকে নিজেকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত করতে চান, চান শান্তা ঘোষের কাছ থেকে টিপ্‌স নিতে, আর স্বপ্নের নায়িকা মারিয়ান জোন্সের দৌড় দেখতে।

মশালবাহকের মৃত্যু ওলিম্পিকে

ওলিম্পিকে মশালবাহক বরাবরই পালন করেন এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাঁদের ঘিরে গড়ে ওঠে অনেক কাহিনী। দৌড়নোর সময় মশালবাহকের মৃত্যু ওলিম্পিক-ইতিহাসে এই প্রথম। এরকমই এক বেদনাদায়ক কাহিনী নিয়ে লিখেছেন উত্তম রায়

রন ক্লার্কের নাম আমরা অনেকেই জানি না। না জানাই স্বাভাবিক, কারণ খুব বড় মাপের দৌড়বীর তিনি ছিলেন না। তা ছাড়া প্রতিনিয়ত ক্রীড়াঙ্গনে এত বেশি রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলা চলছে যে, সেই ভিড়ে কবেই হারিয়ে গেছেন রন ক্লার্ক। তবে অস্ট্রেলিয়াবাসী আজও তাঁকে মনে রেখেছে। তাঁদের হৃদয় থেকে তিনি হারিয়ে যাননি।

অস্ট্রেলিয়ার এই দৌড়বিদ ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন ওলিম্পিকে মশাল বহন করতে গিয়ে পুড়ে যান মশালের পুতাগ্নিতেই। ৪৪ বছর পরে আজও অস্ট্রেলিয়াবাসী ভুলতে পারেননি তাঁদের প্রিয় অ্যাথলিটের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার করুণ ঘটনা।

সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে-ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন সিডনি ওলিম্পিকের কর্তাব্যক্তিরা। দুর্ভাগ্য যেন সর্বদাই তাড়া করে চলেছে অস্ট্রেলিয়াবাসীকে। ৪৪ বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আবার ঘটে গেল বড় মাপের দুর্ঘটনা, সহস্রাব্দের প্রথম ওলিম্পিক, সিডনিতে।

৩১ অগস্ট, ২০০০, ওলিম্পিকের মশাল বহন করার পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন রন কিং। মৃত্যুর আগে জীবনের শেষ ইচ্ছে ওলিম্পিক মশাল বহন করে গেলেন ৭৪ বছর বয়সী প্রাক্তন সাইক্লিস্ট রন কিং। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর হ্যান্টার ভ্যালি অঞ্চলের নির্ধারিত পথ দৌড়নোর পথে এই মর্মন্তুদ ঘটনাটি ঘটে। দৌড় শেষ করার পরেই রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন রন কিং। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ব্যর্থ হয় সব চেষ্টা। অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁর। চিকিৎসকদের মতে, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটেছে রন কিংয়ের। মশাল নিয়ে দৌড়নোর পথে মশালবাহকের মৃত্যু ওলিম্পিক ইতিহাসে এই প্রথম।

ফিরে দেখা যাক ওলিম্পিক মশাল দুর্ঘটনার বছরের দিকে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন ওলিম্পিকে মশাল প্রজ্বলনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল নেপথালিন ব্লক এবং হেক্সামাইন, তা ছাড়া মশালের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের মিশ্রণ। তবে এবার অন্যভাবে অন্য প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে সেই মশাল, যাতে বিপদের বিন্দুমাত্র আশঙ্কা নেই।

এবারের সিডনি ওলিম্পিকে মশাল জ্বালানোর জন্য ব্যবহার করা হবে ৬৫ শতাংশ বিউটেন (সিগারেট লাইটারের জন্য ব্যবহৃত তরল গ্যাস) এবং ৩৫ শতাংশ প্রোপেন (রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস), যাতে মশালের উজ্জ্বলতা বাড়ে। লম্বা টর্চের আদলে তৈরি মশাল, যার মধ্যবর্তী জায়গায় থাকবে দুই তরল গ্যাসের মিশ্রণ। অনেকটা রান্নার গ্যাস স্টোভের বার্নার থেকে যেরকম ধারাবাহিকভাবে আগুন নির্গত হয়, ঠিক সেইরকমই, ৭০ কি.মি. বেশি বেগের ঝোড়ো হাওয়া কিংবা বৃষ্টির জলেও নেভানো যাবে না ওলিম্পিকের এই মশাল।

প্রতি চার বছর অন্তর সমগ্র ক্রীড়া-দুনিয়ার ক্রীড়াবিদ আর ক্রীড়াপ্রেমীরা মেতে ওঠেন। এইরকমই এক আনন্দের মুহূর্তে মনে পড়ে যায় রন ক্লার্কের কথা। 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' হল ওলিম্পিক—আর ওলিম্পিক মশাল হল 'পিস অব লাইফ'। তাই ওলিম্পিকে মশালবাহক বরাবরই পালন করে থাকেন এক বিরাট ভূমিকা। তাঁদের ঘিরে গড়ে ওঠে নানা কাহিনী। ১৫ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির মাটিতে সারা বিশ্বের কোটি কোটি ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ দেখবেন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির আর-এক চমকপ্রদ নিদর্শন পিস অব লাইফ, জ্বলন্ত ওলিম্পিক মশাল। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশ্বসৌহার্দ্যের শপথ নেওয়ার পাশাপাশি কিছু সময়ের জন্য হলেও মনে পড়বে ৪৪ বছর আগের অগ্নিদগ্ধ রন ক্লার্ক এবং এই সহস্রাব্দের প্রথম ওলিম্পিক শুরুর পক্ষকাল আগে হারানো প্রবীণ সাইক্লিস্ট রন কিং-কে।

জার্মানির মাইনৎস শহরে ছাপা হয়েছিল বিশ্বের প্রথম বই ‘গুটেনবার্গ বাইবেল’

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংগঠন সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্যাদা দিয়েছে তাঁকে। আর জার্মান সরকার চলতি বছরকে উৎসর্গ করেছে তাঁর উদ্দেশে। ছাপাখানার জনক গুটেনবার্গকে নিয়ে লিখেছেন অশোক সেনগুপ্ত

এই বছরটা জার্মানিতে ‘গুটেনবার্গ-বছর’। সেই গুটেনবার্গ, যিনি ছাপাখানার আবিষ্কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সেই গুটেনবার্গ, যাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অভিজাত সংগঠন ‘সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি’-র মর্যাদা দিয়েছে। ৬০০ বছর আগে জার্মানির মাইনৎসে জন্ম হয়েছিল গুটেনবার্গের। সেই কারণেই চলতি বছরকে তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছে জার্মান সরকার। সারা দেশে, বিশেষত গুটেনবার্গ সংগ্রহশালায় এই কারণে চলছে আলোচনা-প্রদর্শনী।

৫৪৬ বছর আগের কথা। সেই বছরই জার্মানির মাইনৎস শহরে ছাপা হয়েছিল যন্ত্রনির্ভর ছাপাখানায় মুদ্রিত বিশ্বের প্রথম বই হিসেবে স্বীকৃত ‘গুটেনবার্গ বাইবেল’। বই প্রকাশনার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৪৫৫ সালের ওই ঘটনা। ৪২ লাইনের বইটি ছাপিয়েছিলেন যোহান্ হেনেৎসুম গেনসফ্লাইশ ৎসুর লাড়েন। সংক্ষেপে ‘ৎসু গুটেনবার্গ’। ছাপাখানার জনক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন গুটেনবার্গ। গুটেনবার্গ মারা যান ১৪৬৮ সালে। জীবদ্দশায় কিন্তু স্বীকৃতি পাননি এই জার্মান মুদ্রাকর। ব্যবসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন না তিনি। আগ্রহের আতিশয্যে নিখরচায় বিলি করেছিলেন ওই বই। ফলে অচিরেই তাঁকে দেউলিয়া হতে হয়।

গুটেনবার্গ ছাপিয়েছিলেন মোট ১৮০ কপি বাইবেল। এর মধ্যে ১৫০টি কাগজে ছাপা, ৩০টি পার্চমেন্টে। এখন সারা পৃথিবী খুঁজে মূল বাইবেলের সংরক্ষিত মাত্র ২০টি প্রতিলিপি পাওয়া যাবে। এর মধ্যে ছ'টি আছে মার্কিন মুলুকে। লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে আছে এর একটি।

গুটেনবার্গের বাইবেল ছাপার পরে সাড়ে পাঁচশো বছর কাটতে চলল। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন আকারে এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি ২২ ক্যারাটের সোনার গিল্টি করা পাতায় মরক্কোর অত্যন্ত উঁচু মানের চামড়ায় বাঁধানো হয়েছে এই বাইবেল। জার্মানরা কিন্তু গুটেনবার্গকে ভুলে যাননি। তাঁর বাড়িতে তৈরি হয়েছে আকর্ষক একটি সংগ্রহশালা। সেখানে সময় যেন থেমে গিয়েছে সেই গুটেনবার্গের আমলেই। শহরে রয়েছে গুটেনবার্গের একটি বড় পাথরের মূর্তিও।

মাইনৎসে গুটেনবার্গের সংগ্রহশালাটি মহাযুদ্ধে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জার্মানির অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী ভবনের মতো এটিকেও পুরোপুরি সংস্কার করা হয় এর পুরনো আদল মাথায় রেখে। সেখানে আছে গুটেনবার্গের এবং তাঁর পরবর্তী সাবেক কালের বিভিন্ন সময়ের মুদ্রণযন্ত্র, হরফ প্রভৃতি। ‘গুটেনবার্গ বাইবেল’-এর সংস্করণ দেখার সুযোগও পাবেন আগ্রহীরা ওই সংগ্রহশালায়। আছে তাঁর ব্যবহার্য কিছু জিনিস, ছবি। অদূরেই সেন্ট মার্টিন ক্যাথিড্রাল। গির্জার সামনে প্রশস্ত খোলা বাঁধানো চত্বর। একপাশে সুন্দর ফোয়ারা। অন্যপাশে সারি সারি রেস্তরাঁ। হাঁটাপথে কিছুটা এগোলে ব্যারোক প্রাসাদ। সেন্ট স্টিফেন গির্জায় বিশ্বখ্যাত শিল্পী মার্ক শাগালের আঁকা বিশাল মাপের কাচের জানলা।

খ্রিস্টপূর্ব ১৬ সালে রাইন নদীর ধারে তৈরি হয়েছিল গুটেনবার্গের এই জন্ম ও কর্মশহর মাইনৎস। এটি বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও লুক্সেমবার্গের সীমান্তবর্তী জার্মান প্রদেশ রাইনল্যান্ড-ফালৎস প্রদেশের রাজধানী। এত পুরনো শহর, কিন্তু জীর্ণ বা অপরিচ্ছন্ন নয় মোটেই। রাজ্যের আয়তন ৭ হাজার ৬৬২ বর্গমাইল বা ১৯ হাজার ৮৪৯ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের মতো। রাজধানী মাইনৎসের লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৮৬ হাজারের মতো। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাকও যথেষ্ট। সেখানে পড়াশোনা করেন প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী। এখানে উৎপাদিত জিনিসের প্রায় ৪০ শতাংশ রফতানি হয় বিদেশে।

রক্তমাখা মুখ ধুয়ে ম্যাচ জেতালেন বথাম

অটোগ্রাফ দিতে ব্যস্ত ইয়ান বথাম

অলরাউন্ডার ইয়ান বথামের উত্থানের ইতিহাস রীতিমত চমকপ্রদ। বিশ্ব-ক্রিকেটে স্থায়ী আসন পাওয়ার জন্য তিনি যেভাবে লড়াই করেছিলেন, সত্যি বলতে কী, তা আজ ইতিহাস। লিখেছেন অশোক রায়

ঠিক এই মুহূর্তে যা অবস্থা তাতে খেলার মাঠে ক্রিকেটারদের লড়াই নিয়ে চতুর্দিকে শুধু সন্দেহ, অবিশ্বাস আর হাসাহাসি। অথচ সাতের কিংবা আটের দশকেও লড়াইটা ছিল সত্যিকারের ঘাম-রক্ত ঝরানোর। বিশ্ব-ক্রিকেটে ইয়ান বথামের মতো বিখ্যাত অলরাউন্ডারের উঠে-আসার শুরুটাই তো রীতিমত রক্ত-ঝরানো এক সংগ্রামের ইতিহাস।

সদ্য কৈশোর পার-হওয়া ইয়ান বথাম তখন সবে সমারসেট কাউন্টিতে ঢুকেছেন। বেন্‌সন অ্যান্ড হেজেস টুর্নামেন্টে হ্যাম্পশায়ারের বিরুদ্ধে খেলা। ১৭ বছর বয়সী বথাম যখন ন' নম্বরে ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন, সমারসেটের অবস্থা তখন সঙ্গিন। জেতার জন্য তখনও দরকার ৭০ রান, হাতে অবশিষ্ট মাত্র দু' উইকেট। অলৌকিক ঘটনা ছাড়া অ্যান্ডি রবার্টসের পেস-ঝাপ্‌টা সামলে দুই টেল-এন্ডারকে নিয়ে ম্যাচ জেতা যে অসম্ভব, সেটা সমারসেটের সাহসী আধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজও বুঝে নিয়েছেন।

কিশোর বথাম ক্রিজে আসতেই তাঁকে 'আগুনে অভ্যর্থনা' জানালেন রবার্টস একটা 'বাউন্সার' দিয়ে। চকিতে হুক করলেন বথাম। স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারির ওপর দিয়ে বল উড়ে গেল সোজা মাঠের বাইরে। সমসাময়িক ক্রিকেটারদের মধ্যে রবার্টসের নাম ছিল 'নিঃশব্দ ঘাতক'। ফাস্ট বোলারদের মধ্যে সাধারণত যে 'ফায়ার' ব্যাপারটা থাকে সেটা রবার্টসের রান-আপ, ডেলিভারি অ্যাকশন কিংবা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে কখনও প্রকাশ পেত্ না। কিন্তু যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা বুঝে গেলেন এবার একটা কিছু ঘটবে। এবং ঠিক সেইটাই ঘটল। 'মাথার খুলির ঠিকানা-লেখা' গতিময় একটা বাউন্সার বেরোল রবার্টসের হাত থেকে। গতি এবং আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেলেন বথাম। ঠিক সময়ে লাইন থেকে সরতে না পারায় বল সজোরে এসে লাগল মুখে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরতে থাকল শার্টের ওপর। সমারসেটের ক্যাপ্টেন ব্রায়ান ক্লোজ সঙ্গে সঙ্গে মাঠে পাঠালেন জল আর বরফ। জল দিয়ে মুখ কুলকুচো করতে গিয়ে বেরিয়ে এল একটা ভাঙা দাঁতের টুকরো। কিন্তু মাঠ ছাড়তে চাইলেন না বথাম। মুখে খানিকক্ষণ বরফ ঘষে আবার দাঁড়ালেন ক্রিজে। এর পর যে কাণ্ড ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না স্বয়ং রবার্টসও। নিজে ৪৫ রানে নটআউট থেকে চার ছক্কার ফোয়ারা ছুটিয়ে দুরন্ত বথাম এক ওভার বাকি থাকতে ম্যাচ জিতিয়ে দিলেন। ওই ম্যাচেই ইংলিশ ক্রিকেট সন্ধান পেয়ে গেল নতুন 'হিরো'-র।

খেলতে নেমেই কিছু করে দেখানোর ব্যাপারটা ছিল বথামের সহজাত। '৭৭ সালে ট্রেন্টব্রিজে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম সকালেই বথাম নিজের কাজে নেমে পড়েন পাঁচ উইকেট তুলে নিয়ে। এর মধ্যে ছিল গ্রেগ চ্যাপেল, ডগ ওয়াল্টার্স-এর মতো উইকেট। হেডিংলেতে পরের টেস্টে আবার পাঁচ উইকেট। জীবনের প্রথম দুটো টেস্টেই পাঁচ উইকেট পাওয়ার ঘটনা সত্যিই মনে রাখার মতো, কারণ সমকালীন অন্য তিন বিখ্যাত অলরাউন্ডার কপিলদেব (প্রথম পাঁচ উইকেট পান জীবনের ১০ নম্বর টেস্টে), ইমরান খান এবং রিচার্ড হ্যাডলির (দু'জনেই পান নবম টেস্টে) চেয়ে অনেক আগেই এই কৃতিত্ব গড়েন বথাম। ১৪টি সেঞ্চুরি, একটি ডাবল সেঞ্চুরি, ১২০টি ক্যাচ ধরার নজিরও ওই তিন অলরাউন্ডারের নেই। '৮০ সালে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই)-এ 'জুবিলি টেস্টে' একই সঙ্গে সেঞ্চুরি (১১৪) এবং ১৩ উইকেট নেওয়ার দুর্ধর্ষ কীর্তিও তাঁরই। 'ম্যাচ ডাবল' অর্থাৎ একই ম্যাচে সেঞ্চুরি এবং ৫ উইকেট নেওয়ার কৃতিত্বও দেখিয়েছেন পাঁচবার। টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০০ রান এবং ৩৫০ প্লাস উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব কপিল ছাড়া একমাত্র তাঁরই।

ধা রা বা হি ক

আগে যা ঘটেছে : অনেকদিন পর বাবলু-বিলু-বিচ্ছু-ভোম্বল এবং পঞ্চু খুব ভোরে বেরিয়েছে বেড়াতে। কিছুদূরে গিয়ে হঠাৎ পঞ্চু চিৎকার করে তাড়া করল তিনজন লংকোটপরা লোককে। তাড়া খেয়ে লোকগুলো চৌধুরীপাড়ার গলির মুখ থেকে বড় রাস্তার দিকে ছুটছে। তখনই ভয়ঙ্কর শব্দে কেঁপে উঠল সমস্ত জায়গাটা। ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন। সকলে দৌড়ে গেল শব্দটাকে অনুসরণ করে। পৌঁছল রাজারামবাবুর বাড়িতে। সেখানে সিঁড়ির নীচে হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে বাড়ির দরোয়ান, নেপালি কিশোর, বীরবাহাদুর। ওপরের তলায় বাথরুমে সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত রাজারাম চৌধুরী বন্দি। বাবলু সকালে ঘরে ফিরেছে। অনেকদিন পরে বাবা এসেছেন কর্মস্থল থেকে। দু'জনে গল্প করছে। এমন সময় বাবলুর ফোন এল। ফোনে কথা বলে বাবলু বেশ বিষণ্ণ। বাবার প্রশ্নে বাবলু জানাল, ফোন করেছিল বদমাশ লালজি ভিমানি। লালজি ভিমানি বাবলুর ফোন নাম্বার পেয়ে গেল কীভাবে? আর রাজারামবাবু একা থাকেন কেন? অতবড় বাড়িতে শুধুমাত্র একজন নেপালি দরোয়ান। পাণ্ডব গোয়েন্দারা প্রথমেই তদন্ত শুরু করল রাজারামবাবুকে নিয়ে। বৈশালী আর বিক্রমশীলায় খননকার্যের সময় দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হাতে আসে। এগারোটি হাতে রেখে সমস্তই সরকারের হাতে তুলে দেন রাজারামবাবু। শুধু এই নয়, আছে মূল্যবান একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি। সেই মূর্তির লোভেই খুনের চক্রান্ত করছে লালজি ভিমানি। তারপর...

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

৫

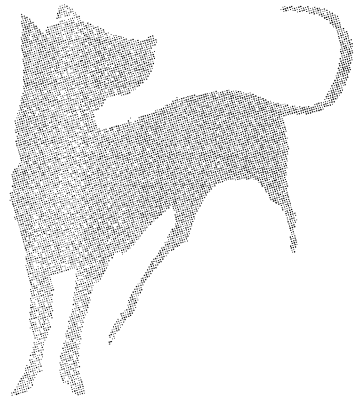

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে এই মুহূর্তে কী করবে, তা ভেবে পেল না। বাইরে বেরনোর দরজা বন্ধ। ওপরের ছাদে ওঠারও উপায় নেই। দুষ্কৃতীরা যাওয়ার সময় শিকল দিয়ে গেছে সেখানে। কিন্তু ওরা পালাল কীভাবে? ওপর থেকে দড়ির মই বেয়ে? না কি এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফিয়ে?

এদিকে রাজারামবাবুর তো এই অবস্থা। জিনিসটা হারানোর শোকে ভদ্রলোকের স্ট্রোক না হয়ে যায়!

বাইরে তখন অনেক লোকজনের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। দারুণ উত্তেজনা।

বাচ্চু আর বিচ্ছু দ্রুত ওপরে উঠে দোতলার জানলা থেকে চেঁচাতে লাগল, "এই যে! শুনছেন? কে আছেন? নীচের দরজাটা একটু খুলে দেবেন? আমরা বেরোতে পারছি না।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই পাড়ার লোকেরা খুলে দিল দরজা। দরজা খোলা পেয়েই পঞ্চু তো এক লাফে বাইরে বেরিয়ে চিৎকারে মাত করে দিল চারদিক।

ওদের মুখে সব শুনে পাড়ারই এক যুবক জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে খুলে দিল সিঁড়িঘরের দরজাটা। তখনই বোঝা গেল দুষ্কৃতীরা এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। হাওড়া শহরের এইসব এলাকার ঘরবাড়ি নিয়মবহির্ভূতভাবেই গড়ে উঠেছিল একসময়। তাই ওদের পালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা এইভাবে পালানোর পথ আবিষ্কার করল কীভাবে? তবে কি গতরাতে সবকিছু দেখেশুনে গিয়েই এই কাণ্ডটা করল আজ? এদিকে বাহাদুরের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যময়।

যাই হোক, পাড়ার লোকজনদের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজারামবাবুকে ধরাধরি করে ওপরে ওঠাল। তারপর বিছানায় শুইয়ে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু সুস্থ করল।

খানিক বাদে লোকজন সব বিদায় নিলে বাবলু বলল, "আপনার সেই ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিলে হত না?"

"কোনও দরকার নেই। তোমরা বরং খোঁজখবর নিয়ে দেখো বাহাদুরটা গেল কোথায়? ছেলেটাকে ওরা মেরেই ফেলল, না গুম করে লুকিয়ে রাখল কোনওখানে?"

বাবলু বলল, "আমার কিন্তু মনেই হয় না ওরা সে সব কিছু করেছে বলে। তার কারণ জিনিসটা ওদের হস্তগত হওয়ার পর বাহাদুরকে খুন করে অথবা কিডন্যাপ করে ওদের লাভটা কোথায়? তা ছাড়া সে রকম কিছু হয়ে থাকলে ওরা ওকে নিয়ে বাইরে দিয়েই চলে যেত। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছাদ দিয়ে পালাতে যাবে কেন?"

"তা হলে বলছ, বাহাদুরের কোনও ক্ষতি হয়নি?"

"তেমন কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে কিনা আপাতদৃষ্টিতে সেরকম সম্ভাবনা কিছু দেখছি না।"

বাবলুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন রাজারামবাবু। তারপর বললেন, "আর দেরি নয়। চলো, তোমাদের সবকিছু আমি দেখিয়ে রাখি। না হলে কখন যে কী হয় তা তো বলা যায় না। প্রথমেই তোমাদের স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখাই। তারপরে মূর্তিগুলো। হঠাৎ করে আমার মৃত্যু হলে ওগুলো তোমরা সরকারের হাতে তুলে দিও।"

মূর্তির চেয়েও স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখার জন্য বেশি করে যেন অধীর হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তাই রাজারামবাবুর সঙ্গে ধীরে-ধীরে নীচে নেমে এল।

বাবলু বলল, "আপনার শরীরের অবস্থা কিন্তু ভাল নয়। ইচ্ছে করলে ওগুলো আপনি কালও দেখাতে পারেন।"

"আজ রাতের মধ্যে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তা হলে কাল তোমাদের দেখাবে কে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না বিপদের মেঘ কী ভাবে ঘনিয়ে এসেছে আমার মাথার ওপর? বাহাদুর যে কেন এখনও ফিরছে না তাও কি বুঝতে পারছ না? অতএব আর দেরি নয়।"

এমন সময় বিচ্ছুই হঠাৎ বলল, "তাই তো, অনেকক্ষণ পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না, পঞ্চু গেল কোথায়?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে উত্তর দিল পঞ্চু, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ—।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুই ওইখানেই থাক। পাহারা দে চারদিকে।" বলে রাজারামবাবুর সঙ্গ নিল।

রাজারামবাবু একবার এসে থমকে দাঁড়ালেন বাহাদুরের ঘরের কাছে।

তারপর ভেতরে ঢুকে সকলকে দেখালেন কীভাবে জিনিসটা লুকনো ছিল ঘরের ভেতর।

সকলে দেখল যে ঘরে বাহাদুর থাকে সেই ঘরেরই এক কোণে মেঝের দুটি মোজেইক টালি খোলা। খোলা জায়গার নীচে একটি হাতখানেক গর্ত। সেটি বেশ ভালভাবে সিমেন্ট দিয়ে মাজা। সেখানে কিছু বিদ্যুৎপ্রবাহী তার এমনভাবে এদিক-ওদিক রয়েছে, যাতে না জেনে যে-কেউ ওর ভেতরে হাত ঢোকালেই মজাটি টের পেয়ে যাবে। সেই জায়গাটার ওপর বাহাদুরের ক্যাম্পখাট থাকার ফলে কারও জানারও কথা নয় ওখানে গোপনীয় কিছু আছে বলে।

রাজারামবাবু বললেন, "অথচ এখন দ্যাখো, ক্যাম্পখাট সরানো। গর্তের মুখ খোলা। সুইচটা এমন জায়গায়, যা কারও চোখে পড়বার নয়, কিন্তু সেটিও অফ করা। এর দ্বারা কী মনে হয়?"

"মনে হয় অন্য কেউ নয়, আপনার বাহাদুরই সরিয়েছে ওটা।"

রাজারামবাবু বললেন, "ঠিক তাই। কিন্তু কেন এ-কাজ করল ও? চুরির উদ্দেশ্যে? তা ও কখনও করবে না। কেননা ও তো এই বাড়িরই ছেলে। কোনও অভাব তো রাখিনি ওর। এমনকী,এই বাড়িটাও ওকে আমি লিখে দেব কথা দিয়েছি।"

বাবলু বলল, "ওর প্রতি যখন আপনার এতখানি বিশ্বাস তখন আমার মনে হয় ও কোনও-না-কোনওভাবে টের পেয়েছে যে, শত্রুরা জিনিসটা না পেলে আজকালের মধ্যেই হয়তো খুন করবে আপনাদের দু'জনকে। তাই ও জিনিসটা এমন কোথাও রাখতে গেছে যেখানে আপনারা না থাকলেও শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না ওটা।"

"তাই যদি হয় তা হলে সে-কথা আমাকে বলতে কী হয়েছিল? তোমাদেরকেও বলতে পারত। আমি নিজে হাতে জিনিসটা তুলে দিতাম তোমাদের হাতে।"

বাবলু বলল, "দেখুন, কী হয়েছে না হয়েছে ব্যাপারটা, তা খুবই রহস্যময়। এ সবই আমাদের অনুমান মাত্র। বাইরের দরজাটা যদি খোলা থাকত তা হলে কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা অন্যরকম বলে মনে করতাম। ধরেই নিতাম শত্রুপক্ষের লোকেরা ভয় দেখিয়ে জিনিসটা হস্তগত করে ওকে সুদ্ধু নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি।"

"ওই দুষ্কৃতীরা তা হলে ভেতরে ঢুকল কী করে?"

"দু'রকম উপায়ে। হয় আগাগোড়াই ওরা ছাদের রাস্তাটা পছন্দ করেছে অথবা আমরা এখানে আসারও অনেক আগে থেকেই ওরা কোনওরকম ভাবে দরজা খোলা পেয়ে সিঁড়ির নীচে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে বসে ছিল।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন কী যেন ভেবে এদিক-ওদিক করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, "শেষেরটাই ঠিক। তার কারণ রান্নাঘরে সকলের জন্য প্লেটভর্তি খাবারদাবার রয়েছে দেখছি। অর্থাৎ বাহাদুর আমাদের চা খাইয়ে পরে কোনও একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে খাবার আনতে চলে গিয়েছিল। দুষ্কৃতীরা সেই ফাঁকেই ভেতরে ঢোকে। বাহাদুর সম্ভবত ফিরে এসে সেটা টের পায়। তখনই সে চুপি চুপি জিনিসটাকে গুপ্তস্থান থেকে বের করে সরিয়ে রাখতে গেছে অন্য কোথাও। যাওয়ার সময় দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে যাওয়ার ফলে ওরা আর উপায়ান্তর না দেখে বিপদ বুঝে ছাদ টপকেই পালিয়ে যায়।"

বাবলু বলল, "সব অঙ্ক সহজে মেলে না, বুঝলি? বাহাদুর কখনও শত্রুপক্ষের অবস্থিতি টের পেয়ে অমন কাঁচা কাজ করে? বাহাদুরের অন্তর্ধান এবং বন্ধ দরজার রহস্যের জট অন্যভাবে খুলতে হবে। ওর নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তা না হলে ও এখনও ফিরল না কেন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পরে কেউ কোনও যুক্তিই দেখাতে পারল না আর।

রাজারামবাবুও রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কোনওরকম

কথাবার্তা না বলে পাশের ঘরের তালা খুলে সকলকে নিয়ে ভেতরে আলো জ্বাললেন। এই ঘরটির মেঝে সমতলের চেয়ে একটু নিচুতে। দু-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তবেই নীচে নামতে হয়। সেখানে আবার লোহার গ্রিলের গেটের বাধা। রাজারামবাবু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর এগোতে না দিয়ে দরজার বাঙ্কের লাগোয়া একটি সুইচ টিপে তারপর গ্রিল;দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ও সবাইকে ঢুকতে বললেন।

ভেতরে ঢুকেই অভিভূত হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। মূর্তির পর মূর্তিতে যেন একটা মূর্তি-মহল্লা। দামি কার্পেটের ওপর বহু যত্নে সাজিয়ে রাখা সেইসব। মূর্তির ভাস্কর্য দেখলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। অধিকাংশ মূর্তিই কষ্টিপাথরের। এর মধ্যে দুর্লভ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটির কোনও তুলনা নেই। কোটি টাকাতেও বোধ হয় এর মূল্য নির্ধারণ হয় না। প্রায় শতাধিক দুর্লভ মূর্তি আছে এই ঘরের ভেতর।

রাজারামবাবু বললেন, "কেমন দেখলে আমার সংগ্রহশালা?"

বাবলু বলল, "চমৎকার।"

"তোমরাই বলো, এইসব জিনিস কি হাতছাড়া করা যায়?"

"না, যায় না। এবার আমরা সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো একবার চোখে দেখতে চাই।"

"দেখাব। সবই দেখাব তোমাদের।" বলে ঘরের শেষপ্রান্তের একটি মূর্তিকে সরিয়ে তার নীচের অংশের একটি মোজেক টালি উঠিয়ে আবার একটি সুইচ অফ করলেন। তারপর সেখান থেকে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া মুদ্রাগুলি বের করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো এগুলো। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার মুদ্রা। দেবী আম্রপালীর হাতে রাজারাজড়ারা তাঁদের যেসব অমূল্য ধন উজাড় করে দিতেন তার সবই তিনি তুচ্ছ জ্ঞানে পুঁতে রাখতেন মাটিতে। কিছু বিলিয়েও দিতেন গরিব-দুঃখীদের। পরে তো সবকিছুই দান করেছিলেন

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াংয়ের কথা শুনে। মেয়েটা বলে কী!

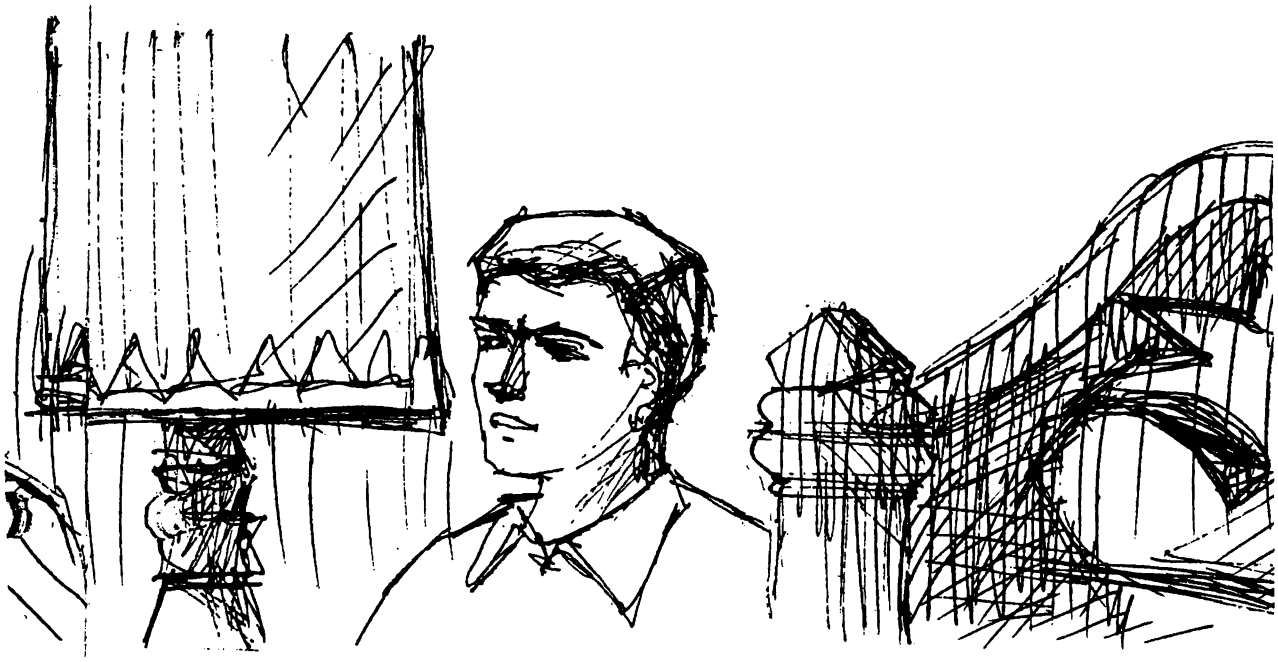

বৌদ্ধসংঘকে। এগুলো তারই নমুনা মাত্র।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্বর্ণমুদ্রাগুলো থেকে একদম চোখ ফেরাতে পারল না।

রাজারামবাবু বলেন, "শোনো, এগুলোয় আর আমার প্রয়োজন নাই। কেননা আমি বুঝতে পারছি আমার দিন এবারে শেষ। এখন আমার কাছে মাত্র দশটি মুদ্রা আছে। এর থেকে তোমরা পাঁচজনে পাঁচটি নাও। আর বাকি পাঁচটা তোমরা কখনও সাহেবগঞ্জে গেলে পৌঁছে দিও আমার মেয়ের হাতে। আমার স্মৃতিগুলো ওকে সযত্নে রেখে দিতে বোলো।"

বাবলু বলল, "আপনি কি সত্যিই এগুলো বিশ্বাস করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। না হলে তো চোরেদের হাতে পড়বে। তোমরা এগুলো নিয়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, এগুলো তোমাদের কাছে স্মারক হিসেবেই থাকবে। অতএব এগুলো রাখার একমাত্র যোগ্য অধিকারী তোমরাই।"

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে আজ আমরা যা পেলাম তা আমাদের জীবনে অনেক অনেক প্রাপ্তির চেয়েও বড় প্রাপ্তি। এ ধন যে আমরা রাখব কোথায় তা আমরাই ভেবে পাচ্ছি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা একটাই কথা বলি, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা যথার্থই। তবে এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারত। কেননা যদি কোনওরকমে দুষ্কৃতীরা সন্ধান পেয়ে ওগুলো চুরি করতে আসত তখন তাদের অবস্থা কী হত তা নিশ্চয়ই জানেন? পাপের বেতন তারা হাতেনাতেই পেত এটা ঠিক। কিন্তু আপনি তখন কী করতেন? অত ডেডবডি কোথায় পাচার করতেন আপনি? যাই হোক, আমরা সব যখন দেখেশুনে বুঝে গেলাম তখন আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনাকে বিপন্মুক্ত করার। বাহাদুরের অন্তর্ধান রহস্য দিয়েই শুরু হবে আমাদের তদন্তের কাজ। পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনার মেয়ের হাতে ঠিকই পৌঁছবে। আর—।

বাবলুকে ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজারামবাবু বললেন, "তবে একটা কথা। আমার স্ত্রী যেন কোনওভাবেই টের না পায় ওই মুদ্রাগুলোর ব্যাপারে। কেননা ও জানতে পারলে ওগুলো ওকে নিতে তো দেবেই না, হয়তো বা ছুঁড়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে। আসলে একমাত্র নিজের এবং মেয়ের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনওকিছুই ওর কাছে মূল্যবান নয়।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় আপনি বোধ হয় ভুল মূল্যায়ন করছেন ওঁর ব্যাপারে। আসলে উনি একজন শিক্ষয়িত্রী এবং একটি কন্যার জননী। আপনার শিল্পবোধকে উনি স্বাগত জানাতে পারেন কিন্তু অবৈধ উপায়ে এই সব সংগ্রহকে উনি সমর্থন করতে পারেন না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না, এখন এই সবকিছু যদি আপনি সরকারের ঘরে জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে যান তা হলে কি সরকার আপনাকে বাহবা দেবে, না পুরস্কৃত করবে? কোনওটাই করবে না। প্রথমেই আপনি অ্যারেস্ট হবেন। তারপরে জেল জরিমানা দুটোই হবে।"

রাজারামবাবু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তা হলে এখন তোমরা আমাকে কী করতে বলো?"

"সেটা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়। যেভাবেই হোক একটা উপায় বের করতে হবে।"

বাইরের দরজার কাছ থেকে তখন হঠাৎই পঞ্চুর একটানা 'ভৌ-ভৌ' ডাক শোনা গেল।

রাজারামবাবু সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে ওদের সকলকে নিয়ে সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাইরে দরজার কাছে গিয়েই দেখলেন পাড়ারই কয়েকজন যুবক দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বাবলু ওদেরই একজনকে বলল, "কী ব্যাপার শোঁটেদা, আপনি?"

তাজা গন্ধরাজের মতো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে কখনও খুন করতে পারে?

"তোদের বাগানের কাছে এইমাত্র একটা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। তাই খবরটা তোদের জানিয়ে দিলাম।"

রাজারামবাবু বললেন, "কোনও সন্দেহ নেই ওই ডেডবডিটা বাহাদুরের। ওকে মেরে ওরা আমাকে জানাতে চায় যে এবার আমার পালা।" বলে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললেন, "এখন তোমরা কী করবে করো। আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

বাবলু বলল, "আপনি একটু সাবধানে থাকুন। আজ আর ঘর থেকে বেরোবেন না। আমরা দেখছি ব্যাপারটা কী।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত পদক্ষেপে ওদের বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। গিয়ে দেখল বাগানের প্রবেশপথের মুখেই একজন লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাথায় জোরালো একটা কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু লোকটি ওদের সম্পূর্ণ অচেনা। কারা কী কারণে তাকে হত্যা করল, তা বোঝা মুশকিল। তবে সুখের কথা একটাই যে, মৃতদেহটি বাহাদুরের নয়। ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে একজনদের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করে যে যার বাড়ি ফিরে এল। সে রাতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এতই ক্লান্ত ছিল যে, এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ আর কোনওরকমভাবেই মাথা ঘামাল না। এমনকী,অমন দুর্ধর্ষ পঞ্চুও কেমন যেন বোবা হয়ে রইল।

পরদিন মর্নিংওয়াকে বেরোল না কেউ। বাবলুও অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোল। নিদ্রাভঙ্গে পাছে ছেলের শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাই মা-ও ডাকলেন না ছেলেকে।

বাবলু ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেরে যখন খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখেছে ঠিক তখনই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। গতকালের ঘটনার একটা সমাধানসূত্র বের করাই যে আসল উদ্দেশ্য তা বোঝাই যাচ্ছে। সকলেরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

মা একবার ঘরে এসে ওদের মুখগুলো দেখলেন। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই জলখাবার তৈরি করে নিয়ে এলেন সকলের জন্য। সেইসঙ্গে গরম চা।

বাবলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

"জানি না। ও তো ভোরেই বেরিয়েছে।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই পঞ্চু ছুটে ঘরে এসে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওর উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল।

বাবলু কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে রে পঞ্চু?"

পঞ্চু ভীষণ ছটফট করতে করতে সাড়া দিল, "ভু-ভু-ভুক। ভো-উ-উ-উ—।"

বিলু বলল, "গোলমেলে ব্যাপার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। না হলে তো পঞ্চু এরকম করবে না!"

খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। একটু কিছু মুখে দিয়ে চায়ের কাপে দু-একটা চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল ওরা।

মা পঞ্চুর জন্য হালুয়া এনেছিলেন এক প্লেট। পঞ্চু সেটা শুঁকে দেখল একবার। তারপর নিয়মরক্ষার জন্য একটু খেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে ছুটল।

বাবলুও বিপদের সম্ভাবনা বুঝে বাইরে যাওয়ার আগে পিস্তলটাকে সঙ্গে নিতে ভুলল না।

বাগানে পৌঁছেই দেখল এক নেপালি কিশোরী মিলিটারি কায়দায় ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে পায়চারি করছে। জিনসের প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় নেপালি টুপি পরা মেয়েটিকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই থমকে দাঁড়াল মেয়েটি।

বাবলু বলল, "তুমি?"

মেয়েটি ওর সুন্দর গোলালো মুখে একটা থমথমে ভাব রেখেই বলল, "আমি রিয়াং দাওয়া লামু। নেপালি, কিন্তু টিবেটিয়ান। আমাদের আদি বাড়ি ছিল লাসার কাছে গ্যাংচিতে। আমার জন্মস্থান লুম্বিনি। যাই হোক, তোমাদের পরিচিত বীরবাহাদুর আমার বন্ধু। আমার বাবা রঘুনাথ লামু ভারত সরকারের গোর্খা রেজিমেন্টের একজন সৈনিক। কারগিলেও তিনি যুদ্ধ করেছেন। আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কখন থেকে হানটান করছি। তোমাদের এই কুকুরটা প্রথমে আমাকে একটু ভয় দেখালেও পরে কিন্তু খুব ভাল ব্যবহার করেছে। শুনেছি তোমরা রোজ সকালে একবার করে এখানে আসো, তা আজ এত দেরি করলে কেন?"

বাবলু বলল, "হয়ে গেল। তবে কিনা এই বাগানে সকালের দিকে সবসময় না এলেও বিকেলে নিয়মিত আসি।" বলে সবাইকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালেই গোল হয়ে বসল।

গতকালের চেয়ে ঠাণ্ডাটা আজ কম থাকায় সবাই সাধারণ পোশাকেই ছিল। তবে কিনা বাগানের মাটিতে ভিজে ভাবটা থাকার জন্য ঘাসের গালিচার বদলে ভাঙা বাড়ির চাতালটাই উপযুক্ত মনে করল।

সকলে যে যার মতো গুছিয়ে বসলে বাবলু পঞ্চুকে বলল, "আমরা আমাদের আলোচনাটা সেরে নিই। তুই তোর কাজ কর। চারদিক ঘুরে দ্যাখ কেউ কোথাও ওত পেতে আছে কিনা।"

বাবলুর নির্দেশ পঞ্চু বুঝল। তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে টহল দিতে লাগল বাগানময়।

বাবলু এবার সরাসরি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা লামু, এবার তোমার কথা বলো। তুমি এইভাবে সকাল থেকে বাগানে পায়চারি না করে আমার বাড়িতে তো যেতে পারতে।"

"তোমার বাড়ি তো আমি চিনি না। এমনকী,তোমাদের নামও জানি না কারও। দেখিওনি কোনওদিন। বাহাদুরের মুখে তোমাদের একজনের নাম শুনেছি , 'বাবলু ভাই'। সে কে? তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। এই নামেই তুমি খোঁজ করলে পারতে।"

"উপায় ছিল না। এই বাগান ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কাল সন্ধের পর থেকে ওই গাছের ডালে বসে জেগে কাটিয়েছি সারারাত।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "ফর হোয়াই?"

রিয়াং বলল, "হোয়াই-এর আগে আবার ফর কেন? শুধু হোয়াই বললেই ল্যাঠা চুকে যেত।"

বাবলু হেসে বলল, "তা যেত। তবে কিনা অত ব্যাকরণ মেনে কি সবসময় ইংরেজি বলা যায়? তা ছাড়া এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যা বাংলা বলতে বলতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখন বলো তোমার এখানে রাত্রিবাসের কারণটা কী?"

রিয়াং কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে রইল। তারপর বলল, "আমার বান্ধবী অনুরাধার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

বাবলু বলল, "অনুরাধা কে?"

"সে কী! অনুরাধা মানে অনু। রাজারাম চৌধুরীর মেয়ে।"

"না, নেই।"

রিয়াং এবার ওর রাতজাগা রক্তাভ চোখে বাচ্চু, বিচ্ছুর দিকে তাকালে ওরাও ঘাড় নাড়ল।

বাচ্চু বলল, "হয়তো কখনও মুখোমুখি হলে দেখলে চিনতে পারব। কিন্তু আলাপ-পরিচয় নেই। তা ছাড়া ও তো শুনেছি এখানে থাকেও না। মাত্র গতকালই বাহাদুর ও রাজারামবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এদিকে কাল সন্ধের পর থেকে বাহাদুরও...।"

"জানি। খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে কাল।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"লালজি ভিমানির লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ও আদৌ বেঁচে আছে কিনা জানি না। তবে কাল রাতে ওদেরই একজনকে আমি খুন করেছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াংয়ের কথা শুনে। মেয়েটা বলে কী! তাজা গন্ধরাজের মতো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে কখনও খুন করতে পারে? না, না, এ অসম্ভব! অথচ কথাটা ও এমনভাবে বলল, যেন খুনটা কোনও ব্যাপারই নয়। ইচ্ছে করলেই কাউকে না কাউকে খুন করা যেতেই পারে।

(ক্রমশ)

মুরগির মাংস, চিংড়ির মালাইকারি

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী

বেলা তখন পড়ে গেছে। ঘুলিগঞ্জ লেকের পাড়ে বসে আমরা তিনজনে—বুলো, টুলো আর আমি, আলুর দম খাচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ আগেই আমরা এখানে পৌঁছে গেছি। যার জন্য আজ আমাদের তিনজনের এখানে আসা, তারই দেখা নেই। অর্থাৎ আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদার এখনও পর্যন্ত কোনও পাত্তাই নেই। অথচ বাইরে বেড়াতে যাওয়ার গরজটা সকলের চেয়ে তারই বেশি। আজ এখানেই সকলে মিলে আমরা ঠিক করব কবে কোথায় বেড়াতে যাব।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ছড়িয়ে পড়ল লেকের ওপর। আবছা অন্ধকারে লেকের জল বেশ কালো হয়ে উঠেছে। গাছের ডালে-ডালে শুরু হয়েছে পাখিদের কিচিরমিচির। অনেকক্ষণ আগেই এসেছি আমরা। মনে হয় ভোম্বলদা আজ আর আসবে না। অযথা লেকে বসে থাকার কোনও মানেই হয় না। তাই উঠি-উঠি করছি আমরা তিনজনে, এমন সময় বর্ষার মেঘের মতো মুখ ভার করে এসে হাজির হল সেই মূর্তিমান—মানে আমাদের বিখ্যাত ভোম্বলদা।

ভোম্বলদার মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা অবাক। সকালেও যে ভোম্বলদা বাইরে যাওয়ার জন্যে চিনিমাখা মিষ্টি মুখে হইহই করেছে, হঠাৎ বিকেলে তার এ কী পরিবর্তন!

তাই একসঙ্গে সকলে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার ভোম্বলদা?"

"ব্যাপার শুনে লাভ কী!" ভোম্বলদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "এবার আর আমার বাইরে যাওয়া হবে না। তোরা যা।"

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। ভোম্বলদার ব্যাপার তো! বোঝা দায়। কে জানে হয়তো কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে প্রচুর খাবারটাবার এসে গেছে—সেসব পেলে কি আর ভোম্বলদা কোথাও নড়বে!

ভোম্বলদার মুখের দিকে আমি তাকালাম। মনে মনে হেসে বললাম, "ব্যাপারটা খুলেই বলো না ভোম্বলদা। বাড়িতে ভালমন্দ খাবারটাবার এসেছে নাকি?"

"তোদের মুখে ওই এক কথা।" ভোম্বলদা বলল, "সব সময় শুধু খাবার আর খাবার। খাবার ছাড়া কি তোরা আর কিছু চিন্তা করতে পারিস না? বসে-বসে আলুর দম খাচ্ছিস আর ওই এক চিন্তা করে চলেছিস। খাই-খাই স্বভাবটা একটু পালটা।"

পেটুক ভোম্বলদার মুখে এমন অদ্ভুত কথা শুনে আমি হাঁ করে বেকুবের মতো তার মুখের দিকে তাকালাম। ভুলো ঢোক গিলল। টুলো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে অভিনয়ের সুরে বলল, "এ কী কথা শুনি আজি গুরু তোমার মুখে।"

ভোম্বলদা বেজার মুখে আমার দিকে তাকাল। তারপর মনের দুঃখে করুণ কণ্ঠে বলল, "বল, তোদের প্রাণে যা চায় তাই বল। আমি বেশি খাই বলেই তো তোরা টিটকিরি করিস—কর।"

"আহা, টিটকিরি করতে যাব কেন!" ভুলো বলল, "হঠাৎ তোমার বাইরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে কেমন যেন খটকা লাগছে।"

টুলো বলল, "আলুর দমটা কিন্তু দারুণ টেস্টি। লেক কালীবাড়ির আলুর দম এমনিতেই দারুণ খেতে। আজ স্পেশ্যাল বানিয়েছে। তা তুমি খাবার ব্যাপারে যা-ই বলো ভোম্বলদা, আজকের আলুর দমটা না খেলে সারাজীবন আলুর দম খাওয়াই বৃথা হয়ে যাবে।"

ভোম্বলদার চোখ দুটো আনন্দে চিকচিক করে উঠল। নোলায় জল এল। কিন্তু মুখে স্পিকটি নট।

ভোম্বলদার অবস্থা দেখে আমি বললাম, "তোমার জন্যে আনব নাকি ভোম্বলদা?"

এবার নোলার জল টেনে ভোম্বলদা বলল, "তা তোরা যখন এত করে বলছিস, তা হলে নিয়ে আয় একটু। তবে বেশি আনতে হবে না। টাকা পাঁচেকের আনলেই হবে।"

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

একটু থেমে ভোম্বলদা আবার বলল, "খাওয়াটা পুরো মুডের ব্যাপার। মুড না থাকলে কি খাওয়া যায়?"

"সে তো ঠিক কথা। মুড থাকলে কি তুমি মাত্র পাঁচ টাকার খেতে! কম করে হলেও ওটা পঞ্চাশ টাকা হয়ে যেত।" গম্ভীর কণ্ঠে টুলো ঠুকল।

কথাটা মিথ্যে নয়। বহুবার আমাদের ঘাড় ভেঙে এক-একবারেই পঞ্চাশ টাকার আলুর দম খেয়েছে ভোম্বলদা। এ-যুগে একথা অবিশ্বাস্য হলেও কিন্তু ষোলো আনা সত্যি। ভোম্বলদার যে মুড অফ এটাই তার বড় প্রমাণ। জীবনে এই প্রথম ভোম্বলদা পরস্মৈপদী টাকায় খাবারের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করল। না হলে নোলার জল টেনেও মাত্র পাঁচ টাকার আলুর দম খেতে যাবে কেন! ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর। তাই আমি ভোম্বলদার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "হঠাৎ তোমার মুড অফ-এর কারণটা কী?"

"সে করুণ কাহিনী শুনে আর কী করবি?" ভোম্বলদা বেজার মুখে আমাদের দিকে তাকাল।

"করুণ কাহিনী!" টুলো বলল, "সে কী

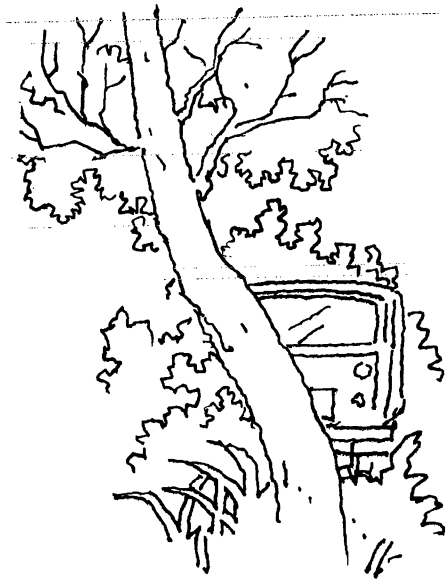

কথা!"

ভুলো বলল, "ব্যাপারটা খুলে বলো তো ভোম্বলদা। আমরা থাকতে তোমার জীবনে করুণ কাহিনী...অসম্ভব।"

সঙ্গে সঙ্গে টুলো বলল, "এ হতে পারে না। আমরা হতে দেব না।"

ভোম্বলদা কী যেন ভাবল। তারপর টুলোর পিঠে হঠাৎ একটা চাপড় মেরে বলল, "আমার হেডে বুদ্ধি এসে গেছে।"

"উঃ..." বলে টুলো চেঁচিয়ে উঠল। একটু বিরক্ত হয়েই বলল, "তোমার হেডে বুদ্ধি আসার জন্যে কি আমার পিঠের হাড়গোড় ভাঙবে?"

"কী যে বলিস তোরা। তোদের পিঠে হাত বোলালেও বলবি হাড়গোড় ভেঙে গেল।"

"বলাটা কি অস্বাভাবিক?" টুলো বলল, "তোমার হাতখানা যে কী জিনিস তা তো তুমি ভাল করেই জানো। বাদ দাও ওসব কথা। আসল ব্যাপারটা বলো, তোমার ব্রেন খুলল কী করে। আর কেন, কিসের জন্যেই বা খুলল?"

"তোর জন্যে?"

"আমার জন্যে তোমার ব্রেন খুলল!" টুলো অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা তো তা হলে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।"

"ঠিকই বলেছিস। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। তোর কাছে আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠবে।"

টুলো বলল, "তা হলে চটপট বলে ফ্যালো।"

ভোম্বলদা বলল, "তুই পারবি রে টুলো, তুই-ই পারবি ওকে টাইট দিতে। ও যতই লম্ফঝম্ফ করুক, তোর কড়ে আঙুলের নখের কাছে ওকে ঘেঁষতে হবে না। তুই ইংরেজিতে কথা বললে ও ইংলিশ বুলি ভুলে যাবে। বলে দিলাম, তোর কাছে ও স্রেফ নট কিছু নাথিং।"

আমরা অবাক হয়ে ভোম্বলদার দিকে তাকালাম। ওর কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ ভুলো বলে উঠল, "তোমার ব্রেন খোলায় আমাদের ব্রেন বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে হয়।"

আহত হয়ে ভোম্বলদা বলল, "আমাকে ঠাট্টা করছিস?"

ভুলো বলল, "এতে ঠাট্টার কী হল?"

"তা হলে এ কথার মানে?" চোখ পাকিয়ে উঠল ভোম্বলদা।

"মানে খুবই সহজ।" আমি বললাম, "তখন থেকে তো শুধু ও...ও...করে গেলে। তোমার ওই 'ওটা' কে, তা তো একবারের জন্যেও বললে না।"

টুলো আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, "ঠিকই তো। 'ও' মানে কী? কোথাকার 'ও'? কে 'ও'?"

"পাঁকাল। ওই পাঁকালটার জন্যেই তো আজ আমার এই দুরবস্থা।"

"পাঁকাল!" ভুলো বলল, "সে আবার কে?"

ভোম্বলদা বলল, "আমার পিসেমশাইয়ের ছোট ভাইয়ের বড় ছেলে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল। সেই জন্যই ওর এত ডাঁট। আমাকে দেখলেই উনি বাংলা ভুলে গিয়ে একেবারে বিলিতি সাহেব হয়ে যান।"

"কীরকম ...কীরকম?" আমরা সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

ভোম্বলদা বলল, "আমাকে দেখলেই ইংরেজিতে কথা। আর সে কী ইংরেজির ফোয়ারা! আর আমার ইংরেজির দৌড় তো তোদের জানা। এবার আমার অবস্থাটা বোঝ।"

টুলো বলল, "ও ইংরেজি দেখাচ্ছে, দেখাক। তাতে তোমার কী হল?"

"হবে আবার কী!" ভোম্বলদা বলল, "যা হওয়ার তাই হয়েছে। ওর ইংরেজি বলার জন্য আমাকে মুখ শুনতে হল। যাকে বলে একেবারে নাকানিচোবানি।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

ভোম্বলদা বলল, "তা হলে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি। আজ সকালে 'বাবু' আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হতেই শুরু করলেন ইংলিশ বুলি। আমি ওর ইংরেজি কথা ঠিকমতো বুঝতে পারছিলাম না। যতটুকু বুঝতে পারছিলাম তার জবাব দিচ্ছিলাম বাংলায়। ব্যস, আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে বাবা সাপের মতো ফোঁস করে উঠলেন—'দূর হ গণ্ডমূর্খ! দিনরাত শুধু আড্ডা। আমি কি তোকে ধানচাল দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? ইংরেজিতে একটা কথা বলতে গেলে দাঁত ভেঙে যায়। লজ্জাও নেই। হনুমান কোথাকার!'"

"আশ্চর্য!" ভুলো বলল, "এর জন্যে মেসোমশাই তোমাকে এইভাবে বকাবকি করলেন?"

"তা হলে ভেবে দ্যাখ এবার। সাধে কি আর আমি বাইরে যেতে চাইছি না!"

টুলো বলল, "মাত ঘাবড়াও। বাইরে তুমি আলবাত যাবে। বোলাও তোমার পাঁকালকে। টের পাবে ইংরেজ সাজার মজাটা। পাঁকালকে নাকাল করে মাকাল বানিয়ে ছাড়ব। ওর বাংরেজগিরি চিরদিনের মতো শেষ হয়ে যাবে।"

ভোম্বলদা বলল, "বাংরেজগিরি! সেটা আবার কী?"

টুলো বলল, "এটা তো একটা বিখ্যাত শব্দ। বাঙালি হয়ে যে ইংরেজ সাজে তাকেই বলে বাংরেজ।"

"কথার মতো একখানা কথা বলেছিস টুলো।" ভোম্বলদা বলল, "এই জন্যেই তো একটু আগে বললাম আমার মাথায় বুদ্ধি এসে গেছে। তুই পারবি ওকে টাইট দিতে। এমন ইংরেজি ঝাড়বি যাতে বাছাধন একেবারে ফিউজ হয়ে যায়।"

টুলো বলল, "ইংরেজি দরকার হবে না। তুমি শুধু ওকে নিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে। তারপর দেখবে রগড়খানা।"

কথাটা বলে টুলো পাঁকালকে টাইট দেওয়ার ছকটা আমাদের বলল। দারুণ আইডিয়া। সত্যি টুলোর ব্রেনের তারিফ করতে হয়। ক্ষুব্ধ

ভোম্বলদা মুগ্ধ হয়ে বলল, "কোথায় যাওয়ার কথা ভেবেছিস তোরা?"

আমি বললাম, "মুর্শিদাবাদ।"

"ভেরি গুড আইডিয়া।" ভোম্বলদা বলল, "যে-পলাশির বাগান দিয়ে ইংরেজ ঢুকেছিল সেই পলাশিতেই ওর ইংরেজ সাজার শখ মিটে যাক। তো, কবে রওনা দিতে চাস তোরা?"

"কালই।"

মেজাজে ভোম্বলদা বলল, "ঠিক হ্যায়।"

পরের দিনই রওনা হলাম আমরা মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে।

আমাদের যাত্রা যখন শুরু হল রাত্তির তখন সন্ধে। দূরাকাশের বুকে কেবলমাত্র একটা সন্ধ্যাতারাই জেগে উঠেছে। সাদা মারুতি নিয়ে ভাঙাচোরা পথ ধরে আলো-আঁধারির মাঝখান দিয়ে চলেছি আমরা পাঁচজন—আমি, টুলো, ভুলো, ভোম্বলদা আর পাঁকাল।

কলকাতা থেকে অনেকটা দূরেই এসে গেছি আমরা। রাতও অনেকটা এগিয়ে গেছে। একে খানাখন্দে ভরা রাস্তা, তার ওপর লরি চালকদের মর্জিমতো লরি চালানোর জন্যে আমাদের গাড়ি চলেছে আস্তে-আস্তে, নাচতে-নাচতে।

এমনি করে যেতে যেতে আমরা যখন একটা মেঠো রাস্তার ধারে পৌঁছলাম রাতের অন্ধকার তখন অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে ভোরের পাখিদের কলকাকলি। পুব আকাশের বুকে সুয্যিমামাও উঁকি মারতে শুরু করেছে।

হঠাৎ তখন ভুলো বলল, "একটু চা খাওয়া দরকার।"

গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে তখন আমি। ভুলোর কথায় সায় দিয়ে টুলো বলল, "কাছাকাছি কোনও

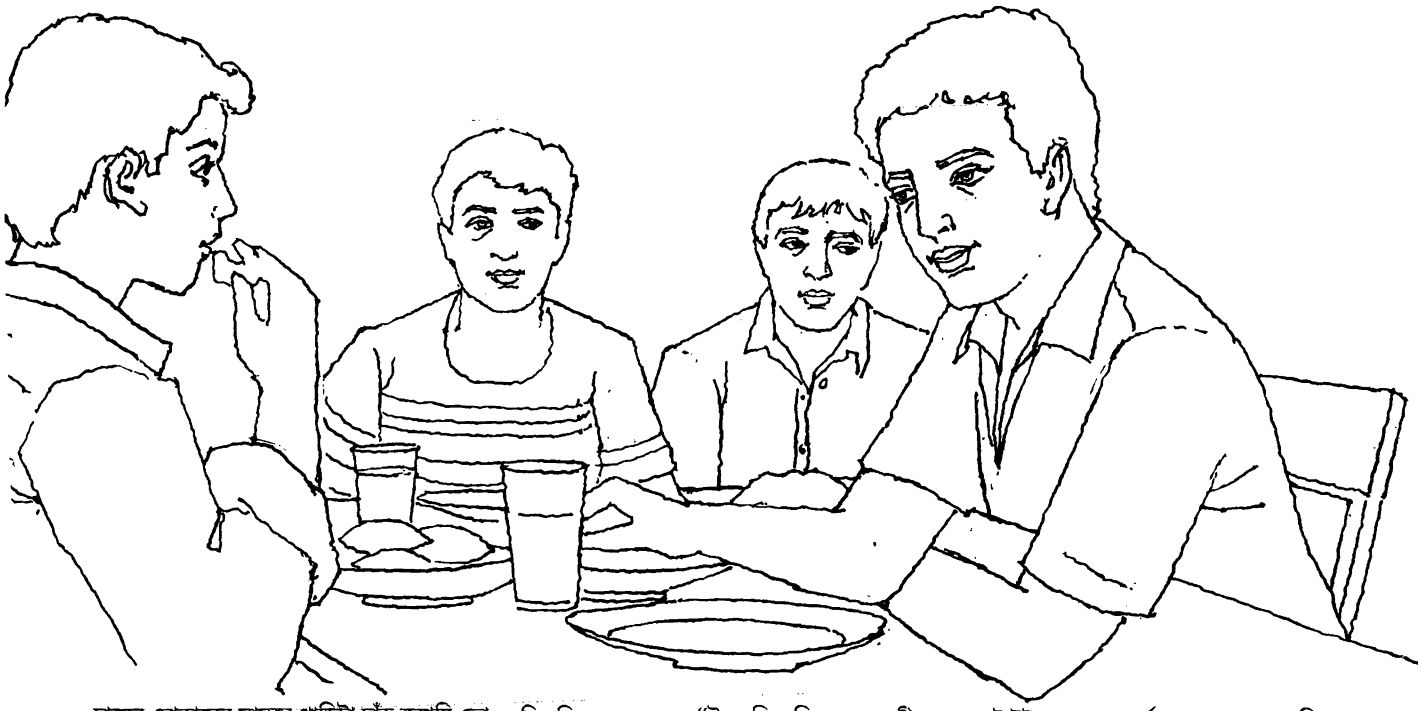

চায়ের দোকানের সামনে গাড়িটা দাঁড় করাবি তো হুলো।"

ভোম্বলদাও বলল, "সারারাত হুলো আর ভুলো গাড়ি চালিয়েছে। ওরা খুবই ক্লান্ত। ওদের দুজনেরই আগে চাঙ্গা হওয়া দরকার। এখনও অনেকটা পথ বাকি। আমরা তো কেউ আবার গাড়ি চালাতে জানি না।"

আমি বললাম, "গাড়ি চালানোর কথা ছাড়ো। এখন সবারই চায়ের দরকার। আমি তো গাড়ি চালাচ্ছি। তাই তোমরা একটু ভাল করে নজর রেখো। দোকান টোকান যেন পেরিয়ে..."

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ পাঁকাল বলে উঠল, "রাস্তার ধারে এইসব নোংরা দোকানে চা খেতে হবে! অসম্ভব। তার চেয়ে বরং হোটেলে গিয়ে খাওয়া যাক।"

টুলো বলল, "দ্যাখো ভাই বাংরেজ, থুড়ি পাঁকাল, রাস্তাঘাটে চলতে গেলে এইসব দোকানে খাওয়া ছাড়া উপায় নেই। অত বাছবিচার করতে গেলে গাড়িতে বেড়ানো যায় না—বেড়াতে হয় প্লেনে করে।"

গম্ভীর মুখে পাঁকাল টুলোর দিকে তাকাল।

সামনেই ছোট্ট একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামালাম। দোকানে অল্পবয়সী দুটো ছেলে। কথায় কথায় জানলাম ওরা দুই ভাই—একজনের নাম চুমচুম আর-একজনের নাম ঝুমঝুম।

"বেড়ে নাম তো তোদের!" আমি বললাম, "চা ভাল হবে তো রে?"

"ভাল হবে না মানে! এক লম্বর চা হবে। একবার খেলে বারবার আসতে হবে।"

ওদের ইংরেজি শুনে পাঁকাল চুমচুম-ঝুমঝুমের মুখের দিকে তাকাল।

টুলো আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, "ইংরেজি বুলির হয়েছে কী! সবে তো এক 'লম্বর'। এর পর লম্বরের পর লম্বর আসবে। তখন রগড়খানা দেখিস। বাংরেজের মাতব্বরি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

আমাদের চারজনের হাতে চায়ের গ্লাস দিয়ে চুমচুম-ঝুমঝুম পাঁকালকে বলল, "আপনি আমাদের দোকানের চা খেলেননি বাবু, খেলে বুঝতেন 'টেস' কাকে বলে।"

দারুণ টেস্ট। আমরা চারজনেই একবাক্যে স্বীকার করলাম।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে চুমচুম-ঝুমঝুম বলল, "আবার আসবেন বাবুরা। আরও ভাল করে চা বানিয়ে দেব।"

চুমচুম-ঝুমঝুমকে টা-টা করে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। এবার গাড়ি চালাচ্ছে ভুলো। গাড়িতে উঠে হই-হই করতে করতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। পাঁকাল কিন্তু সারাক্ষণ চুপচাপ—একেবারে স্পিকটি নট।

যে হোটেলে আমরা উঠলাম তার নাম—রংতামাশা। মালিকের নাম—তপসি চোকশি। বেয়ারা দুটোর নাম—পিংপং আর ডিংডং।

ভোম্বলদা বলল, "নামের কী বহর রে বাবা!"

"এখন তো শুধু নামের বহর দেখছ।" টুলো বলল, "এর পর অনেককিছুর বহর দেখতে পাবে।"

ভোম্বলদা ফিসফিস করে বলল, "এই তো চাই। এই তো হওয়া উচিত। সেই জন্যেই তো আমাদের বাইরে আসা।"

টুলো বলল, "পাঁকালকে টাইট দিতেই হবে। ওকে টাইট না দেওয়া পর্যন্ত আমার মনে শান্তি আসবে না।"

"আমার চোখেও ঘুম আসবে না।" ভোম্বলদা বলল।

ভুলো বলল, "শান্তি,ঘুম,সব আসবে। এখন খাবারের ব্যবস্থা করো তো। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রেখো ভোম্বলদা, এখনকার খাবারের বিলটা কিন্তু তোমাকেই পেমেন্ট করতে হবে। নো শেয়ার-টেয়ার বিজনেস।"

"ঠিক হ্যায়। কুছ পরোয়া নেহি।" বলে সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল ভোম্বলদা, "এই পিংপং-ডিংডং, জলখাবার কী আছে রে?"

জবাব এল, "লুচি, আলুর দম আর দরবেশ।"

ভোম্বলদা বলল, "চার জায়গায় লুচি-আলুর দম আর দরবেশ নিয়ে আয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চার জায়গায় কেন? পাঁকাল খাবে না?"

ভোম্বলদা বলল, "তিনি এখন বাংরেজ সাজতে গেছেন।"

আমি বললাম, "কীরকম?"

"একটু পরেই দেখতে পাবি।" ভোম্বলদার মুখে মৃদু হাসি।

চার জায়গায় জলখাবার নিয়ে হাজির হল পিংপং-ডিংডং। হঠাৎ পিংপং বলল, "আপনারা তো পাঁচজন এয়েছিলেন। তা একজনকে দেখছি না। তিনি কোথায় গেলেন?"

টুলো বলল, "উনি ভীষণ ঠাকুরভক্ত। চানটান সেরে পুজোটুজো করে তবেই কিছু মুখে দেন।"

ভোম্বলদা, ভুলো আর আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

হোটেলে পৌঁছেই পাঁকাল আগে বাথরুমে ঢুকেছিল। সেভিং টেভিং করে চান টান সেরে পায়জামা- পাঞ্জাবির ওপর গাউন চাপিয়ে পুরো বাংরেজ সেজে এসে হাজির হল। জলখাবার শেষ করে আমরা তখন চা খাচ্ছি। পাঁকাল গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে তাকাল। টুলো আমতা-আমতা করে বলল, "পাঁকালভাই, মনে কিছু কোরো না। জোর খিদে পেয়ে গেছল আমাদের। তাই...।"

"ঠিক আছে,ঠিক আছে..." বলে পাঁকাল ভোম্বলদার দিকে তাকাল।

ভোম্বলদা বলল, "বেয়ারাকে ডেকে দিচ্ছি।"

এবার ডিংডং একা এল। পাঁকালকে দেখে অবাক হয়ে বলল, "এ কী ঠাকুরমশাই। আপনি এ সব কী পরেছেন?"

ডিংডংয়ের কথায় পাঁকাল রেগে আগুন। উত্তেজিত হয়ে বলল, "হোয়াট ননসেন্স! কে ঠাকুরমশাই? তুমি কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছ?"

ডিংডং কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে টুলো তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এই ডিংডং, কত বেলা হয়ে গেছে দেখেছিস? আগে বাবুর জলখাবার এনে দে।"

"বলুন বাবু কী খাবেন?"

"ব্রেকফাস্ট-মেনু লেআও।"

"ও-খাবার এখানে নেই।"

"মানে?"

"মানে আবার কী!" ডিংডং বলল, "আমাদের হোটেলে ও-খাবার হয় না বাবু।"

এবার ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পাঁকাল চিৎকার করে উঠল, "হোয়াট ডু য়ু মিন? তুমি কী বলতে চাও? তখন থেকে তুমি আমার সঙ্গে চ্যাংড়ামো করছ!"

ডিংডং কিছুটা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "আপনার সঙ্গে আমি কেন চ্যাংড়ামো করতে যাব?"

"চ্যাংড়ামো নয় তো কী এটা?" পাঁকাল আরও উত্তেজিত।

আমরা মজা দেখছি।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ছুটে এলেন হোটেলের মালিক। হোটেলের মালিককে দেখে পাঁকাল আরও রেগে গিয়ে বলল, "এটা কী ধরনের ম্যানেজমেন্ট আপনার?"

হোটেলের মালিক কাম ম্যানেজার কাম হেডকুক তপসি চোকশি রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন সার, কী হয়েছে?"

"কী হয়নি বলুন? আপনার এই ডিংডং আমাকে ঠাকুরমশাই বলছে, আমার ড্রেস নিয়ে ঠাট্টা করছে, এমনকী,হোটেলে কোনও ব্রেকফাস্ট মেনু পর্যন্ত নেই বলছে।"

তপসি চোকশি ডিংডংকে এমন ধমক দিলেন যে, বেচারা ভিরমি খেয়ে পড়ে গেল। সামনের নেড়ি কুত্তাটা লেজ গুটিয়ে দে-দৌড়। আমরাও চমকে উঠে বোমকে গেলাম। তারপর খুব বিনয়ের সঙ্গে পাঁকালকে বললেন, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলি সার, তা হলে আপনি সব বুঝতে পারবেন। আমাদের এইসব হোটেলে আপনার মতো সাহেবসুবো লোক বড় একটা ওঠেন না। তাই এই সব ড্রেস-ট্রেসও ওরা খুব একটা দেখেনি। তা ছাড়া 'ব্রেকফাস্ট-মেনু'র মানেই ওরা জানে না। ফলে এই ভুল বোঝাবুঝি। যাকগে, আপনি কী খাবেন বলুন—আমি পিংপংকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

লুচি-আলুর দম পাঁকালবাবু খেলেন না। তেনার অর্ডার মতো টোস্ট-ডিমের ওমলেট এল।

ব্রেকফাস্ট সেরে পাঁকাল আর-এক ঝামেলা বাধাল। পিংপঙের কাছে 'স্টেটসম্যান' পেপার চাইলে ও "স্টোনম্যান-টোনম্যান কী বলছেন বাবু..." বলে দে দৌড়।

আবার তপসি চোকশি হাজির। ব্যাপারটা বুঝে তিনি পাঁকালকে ঠাণ্ডা মাথায় বোঝালেন, "এখানে ইংরেজি কাগজ টাগজ বড় একটা কেউ পড়ে না। পড়ে বাংলা কাগজ। স্টেটসম্যানের নামই হয়তো শোনেনি ওরা। তাই খুনি স্টোনম্যান ভেবেছে। আপনি মনে কিছু করবেন না সার।"

বাংরেজের মাতব্বরি ফল দেখে আমরা মনে-মনে দারুণ খুশি। ভোম্বলদা তো আনন্দে আত্মহারা। এই তো আমরা চেয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে চানটান সেরে আমরা বাইরে বেরনোর জন্যে প্রস্তুত। টুলো পাঁকালকে বলল, "পাঁকাল,তৈরি হয়ে নাও। আমরা বেড়াতে বেরোব।"

"তোমরা যাও, আমি যাব না। আই অ্যাম টায়ার্ড। খেয়েদেয়ে রেস্ট নিয়ে আমি সন্ধের সময় বেরোব।"

"অলরাইট।" টুলো বলল, "আমরা কিন্তু বাইরে খেয়ে নেব। বিকেলবেলায় হোটেলে পৌঁছে তোমাকে নিয়ে বেরোব।"

হইহই করে বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক ঘুরলাম আমরা অনেকক্ষণ ধরে।

গাড়িতে বসে ভুলো বলল, "রাত জেগে গাড়ি চালালাম আমি আর হুলো। আর সারারাত ঘুমিয়ে টায়ার্ড হল কি না বাংরেজ।"

টুলো বলল, "সবে তো কলির সন্ধে। মাত্র তিন-চার লম্বর হয়েছে। এখনও অনেক লম্বর বাকি। দ্যাখ না মজাটা।"

আনন্দের ঠেলায় হাড়কিপটে ভোম্বলদা আমাদের দুপুরবেলার খাওয়ার পুরো বিলটাই নিজে পেমেন্ট করল।

সন্ধের দিকে হোটেলে ফিরে দেখি মুখ গোমড়া করে বসে আছে পাঁকাল। আমাদের দেখে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

আমরা ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই তপসিবাবু এসে বললেন, "ক্যাশে অন্য লোক বসিয়ে একটা জরুরি কাজে আমি বেরিয়ে যাই। পিংপং-ডিংডং-ই সবাইকে খাবারদাবার দেয়। সবাই ওদের নাম ধরেই ডাকে। পাঁকালবাবু ওয়েটার ওয়েটার বলে হাঁক পাড়েন। কিন্তু ওয়েটার কাকে বলে তাই তো ওরা জানে না। তবুও পিংপং ছুটে আসে। উনি পিংপঙের কাছে লাঞ্চ-মেনু চান। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঘটল সেই সকালবেলার ঘটনা। লাঞ্চ-মেনুর মানেই ও জানে না। তাই এই খাবার নেই বলে যথারীতি চলে যায়। পাঁকালবাবুরও আর খাওয়া হয়নি। ইস, সারাদিন না খেয়ে আছেন ভদ্রলোক। মিনিটপাঁচেক আগে আমি হোটেলে ফিরে সব জানতে পারি।"

সব কথা শুনে মনে-মনে আমরা দারুণ খুশি। হাসি পেলেও হাসতে পারছি না। মুখে তো সহানুভূতির বুলি বলতেই হবে। তাই আমি বললাম, "আহা, সারাদিন বেচারা না খেয়ে আছে। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।"

চিন্তিত মুখে তপসিবাবু বললেন, "এই অসময়ে কী করি বলুন তো।"

টুলো বলল, "চা-ওমলেট অন্তত দিন। থাকলে গোটাদুয়েক কেকও দিন।"

তপসিবাবু বললেন, "দেখি কী করা যায়। তবে জানেনই তো আপনারা এই সব ছোট হোটেলে অসময়ে কিছুই থাকে না।"

তপসিবাবুর কথা শুনে হাউমাউ করে উঠল পাঁকাল। কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "সারাদিন না খেয়ে আমার মাথা ঘুরছে, চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।"

ভুলো হেসে ফেলল।

টুলো বলল, "শোনো পাঁকাল, তোমাকে একটা কথা বলি। বাঙালির ছেলে হয়ে ইংরেজ সাজার এত শখ কেন? ইংরেজি বুলি আওড়ালেই কি দাম বেড়ে যায়? ইংরেজি বলতে তোমাকে বারণ করছি না। যেখানে দরকার সেখানে বলো। অযথা বাড়িতে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, ছোটখাটো হোটেল-রেস্টুরেন্টে ইংরেজি বুলি আওড়ে বাহাদুরি দেখিয়ে লাভ কী? ফল তো হাড়ে-হাড়ে টের পেলে। যেখানে-সেখানে আর ইংরেজি বুলি আওড়াতে যেও না। কথায় বলে যস্মিন দেশে যদাচার।"

চোখ মুছতে মুছতে পাঁকাল টুলোর দিকে তাকাল।

মিষ্টি মুখে ভোম্বলদা বলল, "এই পাঁকাল, তোর খাবার এসে গেছে। খেয়ে নে। চল, বাইরে বরিয়ে তোকে পেট ভরে খাইয়ে দেব।"

আমরা অবাক চোখে ড্যাবড্যাব করে ভোম্বলদার দিকে তাকালাম। ভোম্বলদা যে আজ সত্যি-সত্যি কবি হয়ে উঠেছে।

এদিকে পাঁকালকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। গাড়িতে ওঠার সময় পিংপং-ডিংডং চিৎকার করে বলল, "রাত্তির বেলায় মুরগির মাংস আর চিংড়ির মালাইকারি হবে।"

আমাদের চারজনের মুরগির মাংস আর চিংড়ির মালাইকারির কথায় নোলায় জল এলেও পাঁকাল নাকাল হওয়ার দুঃখে চুপ করে রইল।

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

গম্ভীরবাবার মালদা-যাত্রা

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সবে বাইরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ঠাকুর প্রণাম সেরেছেন প্রীতিকণা। বেরোবার ভীষণ তাড়া। ইদানীং প্রায়ই এমনটা হচ্ছে। এটা-ওটা সারতে-সারতেই কখন যে সময় গড়িয়ে যায়, টেরও পান না। শেষ মুহূর্তে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এই তাড়া। অথচ মাঝের পাড়াটা পেরোলেই স্কুল। প্রাইমারি স্কুল। প্রীতিকণা সেই স্কুলের থার্ড দিদিমণি। নেই নেই করেও অনেক দায়িত্ব। হেড মিস্ট্রেস একাচোরা মহিলা। দায়-দায়িত্বের ধার ধারেন না। স্কুলের কাছেই কোয়ার্টারে থাকেন। সর্বক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। বিয়ে-থা করেননি। গ্রামের একটি মেয়ে এসে তাঁর সব কাজ করে দিয়ে যায়। তবু স্কুলে আসতে দেরি করেন। সেকেন্ড দিদিমণি বেলাদি বিবাহিতা। বেশ দূরে বাড়ি। দুই দিদিমণি মিলে হেড মিস্ট্রেসের পাশের কোয়ার্টারে থাকেন। ইদানীং তাঁর শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। ফলে দু'টো ঝামেলাই তাঁকে পোয়াতে হয়।

একটু আগেও ছুটোছুটি করতে করতে প্রীতিকণা ছেলেমেয়েকে পাখি পড়ানোর মতো করে সংসারের সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। দু'জনেই পর পর দু'বছরে বি.এ. পাশ করেছে। অতএব অখণ্ড অবসর। ছেলে এখন বড় হয়েছে। প্রায় সর্বক্ষণই সে গিটার নিয়ে থাকে। নইলে টিভি দেখে, বা রহস্য উপন্যাস পড়ে। ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজ দেখে চাকরির দরখাস্ত লেখে। মেয়ে সদ্যই পাশ করেছে। তার এখন স্বপ্ন এম এ পড়ার। 'মা'র ইচ্ছা অন্য। অনেক হয়েছে পড়াশুনো। বিয়ের পর সেই তো সংসারে হাঁড়ি ঠেলা। তাই সেলাই শেখো। আর অবসর সময়ে গানের চর্চা। যা কাজে দেবে।

দরজার মাথায় মা-দুর্গার পটের উদ্দেশে প্রণাম সেরে বাইরে পা বাড়াবার আগে সবে নিচু হয়ে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করছিলেন প্রীতিকণা, এই সময়ই হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল খোকন। তাঁর একমাত্র ভাই। বলল, "দ্যাখ দিদি, কাকে নিয়ে এসেছি। ঠাকুর গম্ভীরবাবা। সাক্ষাৎ-ভগবান। ভাবলাম তুই তো সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভালবাসিস। তাই সঙ্গে করেই নিয়ে এলুম। নাম গম্ভীরানন্দ হলেও সাধুবাবা লোকটি কিন্তু বেদম হাসিখুশি। কোনও বাছবিচার নেই।"

প্রীতিকণা চমকে চোখ তুলে দেখলেন গেটের বাইরে দশাসই চেহারার জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে। গলায় কয়েক প্যাঁচ রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ত্রিশূল। একমুখ দাড়ি-গোঁফ ভেদ করে মুখে প্রসন্ন হাসি। উজ্জ্বল চোখ দু'টিতে কৌতুক। পেছনে চিমটে হাতে আর কাকে যেন দেখা যাচ্ছে।

প্রীতিকণার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। চোখে অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্ত। শত হলেও সাধু-সন্ন্যাসী। আগ বাড়িয়ে স্বয়ং এসে গেরস্তকে দেখা দিচ্ছেন। এমন পুণ্য ক'জনের হয়। তার ওপর স্বামী, ছেলেপুলে নিয়ে বাস। গত বাইশ বছরের সংসার-জীবনে একে একে কত দেব-দেবী মনীষী এসে স্থান করে নিয়েছেন ঠাকুরঘরে।

ভাইকে বললেন, "যা যা, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন বাবাকে, ভেতরে নিয়ে আয়।" বলে নিজেই এগিয়ে গেলেন গেটের দিকে। প্রায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে হাসি মুখে বললেন, "কী আশ্চর্য, এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।"

সন্ন্যাসীবাবা বোঝা গেল খুবই প্রীত হয়েছেন আপ্যায়নে। বললেন, "গেরস্তের অনুমতি ছাড়া আমি কারও গৃহে প্রবেশ করি না।"

পরক্ষণেই প্রীতিকণার পিলে চমকে দিয়ে তিনি তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, "ব্যোম শঙ্কর।" তারপর ত্রিশূল নেড়ে পা বাড়ালেন। সঙ্গে চেলা। তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, জীর্ণ বেশবাস, চিমসে চেহারা। ভেতরের দরজার সামনে এসে কাঁধের পুঁটুলি থেকে একটা ঘটি বের করে বললেন, "মা, এক ঘটি জল দেবেন। বাবার খড়ম-পা ধোয়াব। পা আর খড়ম না ধুয়ে তিনি কোনও গেরস্তবাড়ি ঢোকেন না।"

প্রীতিকণা গলা চড়িয়ে মেয়েকে এক বালতি জল আনতে বলে ভাইকে আড়ালে বললেন, "তুই বাবাকে নিয়ে ঘরে বসা। আমি একটু স্কুলটা ছুঁয়ে আসি। বাড়িতে বাবু ও মুন দু'জনেই আছে।" বলে বাবার কাছে কিছুক্ষণের ছুটি চেয়ে নিয়ে পথে পা বাড়ালেন প্রীতিকণা।

ফিরে এলেন আধঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু ঘরে ঢুকেই চক্ষু চড়কগাছ। গৃহকর্তার বিছানার ওপর বাঘের ছাল পেতে বাবা শায়িত। চেলা তাঁর পা টিপে দিচ্ছে। বাবার দু'চোখ অপলক দেওয়ালে টাঙানো শিবঠাকুরের ছবির ওপর। ঘরে ছেলে, মেয়ে, ভাই কেউ নেই।

বাবুর বাবা বাড়ি থাকলে অমন দৃশ্য দেখে নির্ঘাত তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়তেন। তাঁর বিছানা তাই ভয়েও কেউ স্পর্শ করে না। একবার অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর কোচবিহারের ভাই সেই বিছানায় শুয়ে আছে ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে। বারণ করা সত্ত্বেও শোনেনি। বলেছেন, "দাদার বিছানায় ভাই শোবে এতে আবার দোষ কোথায়? তার ওপর এমন নরম ডানলোপিলোর বিছানা।"

সে-রাত্রে সেই যে লোকটার মেজাজ চড়ল,

নামল পরদিন সকালে। অথচ আসল কারণ তাঁর ভাই জানেন না। উলটে দাদার ওই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে দাদাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "এই বয়সে এত রাগ ভাল না। যে-কোনও সময় স্ট্রোক হতে পারে।"

ভয়ে-ভয়ে প্রীতি এদিক-ওদিকে তাকিয়ে ঘরে ঢুকতেই তড়াক করে গম্ভীরবাবা বিছানায় উঠে বসে সহাস্যে বললেন, "সেই কখন তুমি গেলে। সেই থেকে আমি ওই ছবিটার সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমি অবশ্য আগে দেখিনি। হঠাৎ শিবুদার গলা শুনে তাকিয়ে দেখি ছবির মানুষটা হাসছে। চোখাচোখি হতেই বলল, বড় ভাল জায়গায় এসেছিস। ভক্ত পরিবার। সাধু-সন্তদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। থেকে যা ক'টা দিন। ভাল আদর-যত্ন পাবি।"

প্রীতিকণা এমনিতে ধর্মভীরু। দু'বেলা ঠাকুর-দেবতাদের পুজো না করে জলস্পর্শ করেন না। তাই মুখচোখ থেকে আতঙ্কের ভাব দূর করার চেষ্টা করে বললেন, "সেই কথাই যখন উঠল তো বলি। একবার হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে বৈকুণ্ঠে যাচ্ছি, পথেই দেখা দেবাদিদেবের সঙ্গে। বলল, ডেকে পাঠিয়েছি বলে অত তাড়া করতে হবে? তাই নিজেই নেমে এলুম। বল কী বলবি।"

প্রীতিকণার মুহূর্তের জন্য মনে হল, লোকটা আবার পাগলটাগল নয় তো? কিংবা ধড়িবাজ? পরক্ষণেই ফের ভাবলেন, না, এসব হলে খোকন কখনওই এঁকে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসত না। তাই গম্ভীরবাবা আমার দিকে হাত জোড় করে হেসে বললেন, "আপনি মহাপুরুষ, তাই বাবার দেখা পেয়েছেন। আমরা তো নরকের কীট।"

এই সময় খোকন ঘরে এসে বলল, "দিদি, তুই এসে গেছিস? স্বামীজি রইল। আমার আবার মালদা যাওয়ার তাড়া। বিকেলের রকেট বাস ধরব।"

প্রীতি অবাক হয়ে বললেন, "সে কী! খাওয়াদাওয়া করবি না?"

"যা খেয়েছি তাতেই যথেষ্ট," বলে ভাই চটি ফট ফট করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

সেদিন বিকেল বিকেল অনেক কসরত করে গম্ভীরবাবাকে পাশের ঘরে চালান করা হল। এমনিতে মানুষটার কোনও বায়নাক্কা নেই, খাওয়াদাওয়া নিয়ে কোনও বিরক্তি নেই। দোষের মধ্যে আগ বাড়িয়ে এবং একটু বেশি কথা বলেন। বিশেষ করে বাড়তি লোকজন দেখলে। দুপুরে স্কুলের সহকর্মীরা সাধুদর্শন করে গিয়েছেন। খেপে-খেপেই এ-পাড়া ও-ওপাড়ার লোক আসছে।

বাবু বলল, "সেই থেকে তোমার গম্ভীরবাবা লোক পেলেই কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছে।

প্রীতিকণা ছেলেকে ধমক দিয়ে বললেন, "ছিঃ, সাধু-সন্ত সম্পর্কে অমন অসম্মানজনক মন্তব্য করতে নেই।"

"কিন্তু একে কোথায় পেল সেটা বলে গেছে মামা?"

"না। শুধু বলেছে একশো বছরের মতো বাবা হিমালয়ে সাধনা করে সিদ্ধিলাভের পর মর্ত্যে নেমে শিলিগুড়ির রাস্তায় ঘোরাঘুরি করার সময় নাকি কে তাঁকে ধরে মালদায় নিমাইমামার কাছে জিম্মা করে দিয়েছিল। তার কাছে দিন পনেরো থাকার পর বাবা নাকি খোকনমামাকে স্বপ্নে আদেশ দেয় তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসার জন্য।"

"কিন্তু এত সকালে ওরা কালনা থেকে এখানে এল কী করে?"

বাবু বলল, "কেষ্টনগর থেকে এসেছে। গত ক'দিন গম্ভীরবাবা ওখানেই কার বাড়িতে ছিল।"

মেয়ে বলল, "মা, মনে হয় মামা বেড়াল পার করে দিয়ে গেল।"

কথাটা শুনে ভয়ে প্রীতিকণার চোখ বিস্ফারিত হল। মেয়ের মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে বললেন, "ছিঃ মুনমুন, একজন সাধু সম্পর্কে কী ভাষায় কথা বলতে হয় জানো না? এই তুমি লেখাপড়া শিখেছ?"

"না মা। তুমি তো স্কুলে চলে গেলে। তারপর থেকে ওই দুটো লোককে সামলাতে আমাদের যে কী হ্যাপা পোয়াতে হয়েছে, সে তো তুমি জানো না। গম্ভীরবাবার চানের কী বহর। টিউবওয়েল পাম্প করতে করতে দাদার কাঁধ পর্যন্ত ব্যথা হয়ে গেছে। তবু রক্ষা, চেলাটা নিজেই পাম্প করে জল তুলে চান করেছে। চানের সময় দু'জনের কী মন্ত্র পড়ার ধুম! আশপাশের বাড়ির লোক টের পেয়েছে।"

প্রীতিকণা এবার প্রমাদ গনলেন। ওদের বাবা বাড়ি এসে এসব দেখলে কী যে হবে, ভেবেই তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। সেই কোন সকালে দুটো নাকেমুখে গুঁজে শহরে গেছে অফিস করতে লোকটা। ফিরতে ফিরতে রাত।"

লোকজনের একটু ভিড় পাতলা হতে প্রীতিকণাকে পাকড়ালেন গম্ভীরবাবা। বললেন, "কই, এত রাত হল, কেলোটাকে তো দেখছি না?"

প্রীতিকণা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেলো কে?"

"কেন, তোমার স্বামী? ওই নামই তো আমি স্বপ্নে পেয়েছি। ভুল হল কি?"

এবার প্রীতির রাগ হল। ডাকনাম হোক আর যাই হোক স্বামীর নাম নিতে নেই স্ত্রীর। তবু তিনি বললেন, "কেলো হতে যাবে কোন দুঃখে। ও তো আমাদের কুকুরের নাম। ওঁর নাম কানু। টকটকে ফরসা গায়ের রং।"

"ওই হল। ঘুম-ঘুম অবস্থায় স্বপ্নে পাওয়া তো। একটু এদিক-ওদিক হতেই পারে। তা ওই কুকুরটা পোষা তো?"

প্রীতি বললেন, "পাড়ার কুকুর। খেতে দিই বলে রাত্রে বাড়ি পাহারা দেয়। আমার ছেলের খুব ন্যাওটা।"

গম্ভীরবাবা বললেন, "যাক, বাঁচা গেল। আমায় পেলে কুকুর আর পিছু ছাড়ে না। কেন রে ব্যাটা, আমি কি যুধিষ্ঠির যে আমাকে ধরে

বৈতরণী পার হবি?"

কথা শুনে প্রীতিকণা যে খুব প্রসন্ন হলেন তা নয়। তাঁর তখন একটাই ভয়, এসব দেখেশুনে কী মূর্তি ধারণ করবেন ঘরের মানুষটা! নিজের ভাইয়ের ওপরই তখন তাঁর বেদম রাগ হল।

কিন্তু যা আশঙ্কা করেছিলেন তা হল না। ঘরে পা দিয়েই কর্তা খুশি হয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ ধূপধুনোর গন্ধ তো? তার সঙ্গে আর একটা কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি?" বলতে বলতে পাশের ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন গৃহকর্তা। দেওয়ালে হেলান দিয়ে আধশোয়া এক দর্শনধারী সাধুবাবা। পাশে অনেক ঠাকুরের পট। তাঁর সামনে ধূপধুনো। দেখে বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল তাঁর মন।

প্রায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠতেই গম্ভীরবাবা বললেন, "কানু তো?"

"আজ্ঞে।" জোড়হাত করে কানু বললেন।

"স্বপ্নে তোদের দেখা পেয়েছিলাম। তাই এসে গেলুম।"

"বেশ করেছেন। এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য।"

অন্যদিন বাড়ি এসে এই সময়টায় তিনি হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করেন। কোকো দিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খান, একটু আয়েস করেন। তারপর হাত-পা ধুয়ে খেয়ে শুয়ে পড়া।

কিন্তু আজ তা হল না। হাত-পা ধুয়ে এক কাপ চা নিয়েই এ ঘরে চলে এলেন। উঠলেন গম্ভীরবাবা হাই তুলতে।

মাঝরাত্রে একটা চাপা গুম গুম শব্দে প্রীতিকণার ঘুম ভেঙে গেল। খানিক সময় কান পেতে থাকতেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। দুটো লোকের নাকের ডাক জড়িয়ে ওইরকম শব্দটা হচ্ছে। এবং সেটা ক্রমবর্ধমান।

তারপর এমন একটা সময় এল যখন মনে হতে লাগল দুটো ছোট জেনারেটর বাড়ির ভিত কাঁপিয়ে ক্রমাগত দমফাটা শব্দ করে যাচ্ছে।

সে রাতটা এইভাবেই কাটল। বাকি রাত আর প্রীতিকণার দু'চোখের পাতা এক হল না।

ভোর হতেই দেখলেন যে-ছেলের সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙতেই চায় না সে লাল চোখ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। বলল, "মামা অদ্ভুত

একটা লোককে রেখে দিয়ে কেটে পড়েছে। সারারাত ঘুম নেই। সারাক্ষণ ঘরের দরজা জানলা থরথর করে কেঁপেছে গম্ভীরবাবার নাকের ডাকে। ইচ্ছে হচ্ছিল নাকে একটা ক্লিপ সেঁটে দিয়ে আসি। চেলাটাও জুটিয়েছে তেমনিই।"

মেয়ে মুনমুনেরও সেই অবস্থা। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়েই বলল, "সারারাত ধরে খাট কাঁপলে কি ঘুম হয়? তার ওপর বাইরে কেলোটার চিৎকার।"

কিন্তু প্রীতিকণার বেশি ভয় তাঁর কর্তাকে নিয়ে। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হলে সারা সকালটা তিনি বাড়ি মাত করে রাখবেন। তাঁর বিছানায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, বেঘোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন তিনি।

এতক্ষণে স্বস্তি পেলেন প্রীতিকণা।

কিন্তু বেলায় উঠে, "আজ আর অফিসে যাব না" ফরমান জারি করে তিনিও যখন চা খেতে খেতে বললেন, "সাধুবাবা আর তাঁর চেলা খুব পরিশ্রান্ত ছিল বোঝাই গিয়েছে তাঁদের নাকের ডাক শুনে। আমি তো ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগার আগে পর্যন্ত ঘুমোতেই পারিনি। হয়তো ক'দিন খুব খাটুনি গেছে বাবার। কাল রাত্রে দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সেটা।"

তারপর মুখটুখ ধুয়ে চা খেতে যতক্ষণ, তারপরই তিনি সাধুবাবাকে নিয়ে পড়লেন। কর্তার আবার জ্যোতিষীর ওপর অগাধ বিশ্বাস। তেমন মনের মতো লোক পেলে আর সময়জ্ঞান থাকে না তাঁর। একে সন্ন্যাসী, তায় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। একসময় তোরঙ্গ থেকে পুরো পরিবারের ঠিকুজি কোষ্ঠী বেরোল। ছেলেমেয়ে বউকে ধরে ধরে হস্তরেখা দেখানো হল। শেষে ঠিক হল শনি-মঙ্গলবার দেখে একটা অসুরবিনাশিনী যজ্ঞ করা হবে।

তিনদিন পরে সেই যজ্ঞের দিনে বাবার আবার অন্য রূপ। যত যজ্ঞ এগোয় তত চেলা পিটুনি খায়। যেন গুরুর ঘাড়েই অপদেবতা ভর করেছে।

এ-পাড়া ও-পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক এসে সেই দৃশ্য দেখছে।

বাবার হুঙ্কার ও যজ্ঞ যখন শেষ হল, বাড়ি আস্তে-আস্তে হালকা হল, তখন আবার এক বিপদ, চেলাটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা বললেন, "যজ্ঞটজ্ঞ করার সময় আমার আবার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন অপদেবতা জ্ঞানে এটাকে পেটাই। দ্যাখোগে, হয়তো কোনও গাছে উঠে বসে আছে। খিদে পেলে ঠিক নেমে আসবে।"

কিন্তু গাছ নয়, বাবু তাকে আবিষ্কার করল তার দোতলার ঘরের খাটের নীচ থেকে।

রাত্রে খেতে বসে মাকে বলল, "সাধুবাবা খেপে গেলে নাকি তাঁর জ্ঞান থাকে না। তখন ওই চেলাটাকে পাকড়ান। তারপর একটা ছুতো করে তাঁর মাথার চুল ছেঁড়েন। সেই দুঃখে ও সর্বক্ষণ ন্যাড়া হয়ে থাকে। লোকটা একটা পাষণ্ড।"

প্রীতিকণা জিভ কেটে বললেন, "ছিঃ, সাধু-সন্তদের সম্পর্কে অমন কথা বলতে নেই। ওই চেলা পেটানোর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। নিশ্চয় তাতে গেরস্তের কল্যাণ হয়।"

বাবু রাগত স্বরে বলল, "দু' ব্যাটার নাকের ডাকের ঠেলায় গত পাঁচটা রাত ঘুম নেই। তার ওপর বাবা আবার উসকে দিয়ে দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে ছেড়েছে। আমি কালই বড়-মেসোর বাড়ি চলে যাব। নইলে আমার হাতে ব্যাটার মরণ আছে।"

সেই রাত্রেই প্রীতি কানুকে বললেন, "এমন ভাবে চললে আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ব। ছেলেমেয়ের মুখচোখের চেহারা দেখেছ? নিজের হালত তো ওইরকমই। বাবাকে এবার বিদেয় করো।"

কানু বললেন, "যাই বলো, লোকটা কিন্তু সাচ্চা। আর কী জ্ঞান। এক জন্মের সাধনায় অমন হয় না। তবে ওই এক দোষ, একটু বেশি কথা বলে।"

প্রীতিকণা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, "ভয় ছিল তোমাকে নিয়ে। সেই তুমিও দেখছি লোকটাকে নিয়ে কেমন মেতে উঠেছ। শুনেছি নাকের ডাকে গোরু খুঁটি উপড়ে পালায়। এ দেখছি আমাদেরই বাড়িছাড়া করে ছাড়বে।"

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, মালদায় ফোন করে খোকন বা নিমাইকে ডেকে এনে তাদের হাতে গম্ভীরবাবা ও তাঁর চেলাকে তুলে দেওয়া হবে। নইলে ছেলে এবং মেয়েকে বাড়িতে রাখা যাবে না। গত ক'টা রাত্রে তারা কানে বালিশ গুঁজে কাটিয়েছে। আজ ছেলে গজগজ করতে করতে ডাক্তারকাকুর বাড়ি ঘুমোতে গেছে। মেয়ে গেছে প্রদীপদার বাড়ি বউদির সঙ্গে ঘুমোতে। দু'জনেই বলে গেছে সকালে এসে একটা হেস্তনেস্ত করবে। সেই কথা শুনে প্রীতিকণার বুকের ব্যথা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

সারারাত দুই মহাপুরুষের প্রচণ্ড নাকের ডাকে ছটফট করতে করতে কখন ভোররাতের ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবেই প্রীতিকণার দু'চোখ ক্লান্তিতে বুজে এসেছিল, হঠাৎ বাড়ির বাইরে বাজ পড়ার মতো শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। প্রথমটা কিছু ঠাহর হল না। পরে আস্তে আস্তে সব স্পষ্ট হল। কারা যেন দেওয়াল টপকে বাড়ির উঠোনে ঢুকে কাঁসর ঘণ্টা পিটিয়ে হল্লা জুড়ে দিয়েছে।

তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে পাশের বিছানার ঘুমন্ত মানুষটাকে নাড়া দিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "শিগগির ওঠো। মনে হয় বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। এবার বোমটোম না ছোড়ে।"

বাইরের বাজখাঁই আওয়াজে কানুরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ধড়ফড় করে তিনিও বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। তারপর কয়েক পলক বাইরে কান পেতে বললেন, "নাঃ, ডাকাত নয়। মনে হচ্ছে আশপাশের বাড়ির লোক। গম্ভীরবাবা ও তাঁর চেলার নাকের ডাকে তো পাড়াপড়শিরও ক'রাত ঘুম নেই।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটা অঘটন ঘটল পাশের ঘরে। মনে হল হুড়মুড়িয়ে উঠেই একটা লাশ আছাড় খেয়ে পড়ল। তার সঙ্গে ভয়ার্ত ত্রাহি চিৎকার "ডাকাত ডাকাত। বাত্তি বোলাও।"

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে টর্চ হাতে নেমেই কানু ঘরের বাতি জ্বেলে পাশের ঘরে গিয়ে দেখেন বাবা গম্ভীরনন্দজি বাঘছালে পা দিয়ে চোখ উলটে পড়ে আছেন। আর তাঁর চেলা বাবাজি ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন। মূর্ছা যাওয়ার মতো মুখ-চোখের অবস্থা।

সেই দৃশ্য দেখে কানু বললেন, "ঘরে আবার সাপ ঢোকেনি তো? গ্রামে এখন যা সাপের প্রাদুর্ভাব হয়েছে না! ওরা ডাকাত নয়। মনে হয় সাপ তাড়া করতেই বেরিয়েছে সবাই।

পরদিন সকালে ঠাকুর গম্ভীরবাবা বললেন, "সাপকে আমার ভীষণ ভয়। এরকম জানলে আমি কখনওই এখানে এতদিন থাকতাম না। সাপের ভয় না থাকলে তো বাবার কাছে কৈলাসেই গিয়ে থাকতে পারতাম।"

এই প্রথম স্বামীজিকে সত্যি-সত্যি গম্ভীর দেখাল।

সেদিন আর খাওয়াদাওয়ার পর ঠাকুর গম্ভীরবাবা বিশ্রাম করলেন না। বললেন, "আর লোকালয়ে নয়, আবার আমি হিমালয়ে চলে যাব। পথে এই চিমটেটাকে ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে যাব। কতদিন বলেছি, অত নাক ডাকাসনি, গেরস্তরা সহ্য করতে পারবে না। তা কে শোনে সে-কথা।"

তারপর বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি বাবা দুটো টিকিট কেটে আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো। আজকাল আবার চেকাররা সাধু-সন্তদের রেয়াত করে না।"

বাবা দুই মহাপুরুষকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন, "ভোররাত্রে ডিফেন্স পার্টিকে লাগিয়েছি। এবার লাগিয়ে এলাম খোকনমামার পেছনে। দুই বাবাকে মালদার টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়েছি। মামার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি। ওই মামারই তো ভাগনে আমি।"

ছবি : অনুপ রায়

শুক্র গ্রহে দ্বিতীয় অভিযানেই সফল হয়েছিল আমেরিকা

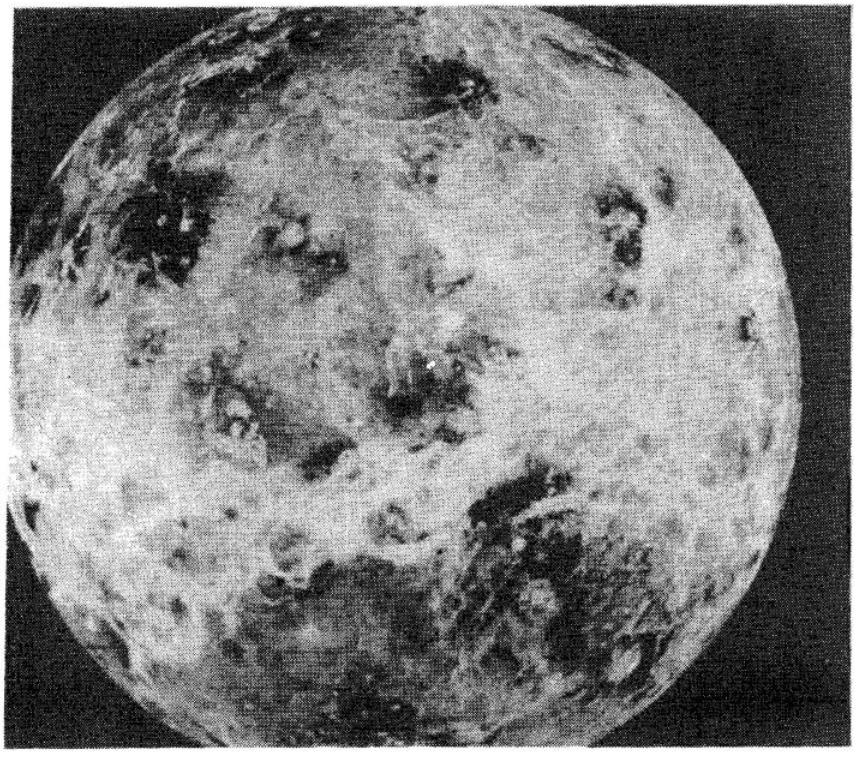

শুক্র অভিযানে আমেরিকার সাফল্য ছাপিয়ে গিয়েছিল রাশিয়াকে। আলোচনা করেছেন প্রদীপচন্দ্র বসু

শুক্র অভিযানে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রথম তিনটি উৎক্ষেপণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিযান আংশিক সফল হয়। উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে 'ভেনেরা-৭' আন্তর্গ্রহযানের শুক্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর।

রাশিয়ার তুলনায় আমেরিকা দ্বিতীয় শুক্র অভিযানেই বিশেষভাবে সফল। প্রথম অভিযানে জুলাই ২২, ১৯৬২ তারিখে 'মেরিনার-১' আন্তর্গ্রহযান উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর আবহমণ্ডল পেরিয়ে যাওয়ার আগেই এর বুস্টার রকেটে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। গোলযোগের কারণ, কম্পিউটারের প্রোগ্রামে একটা 'হাইফেন' না বসানো। তদন্তের পর আবিষ্কৃত, এই অতি সামান্য ভুলের জন্য সম্পূর্ণ অভিযানটি ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় নাসার বিজ্ঞানীরা প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়েন।

এর এক মাস পাঁচদিন পরে ২৭ অগস্ট, ১৯৬২ সালে উৎক্ষেপণের পর ১৪ ডিসেম্বর 'মেরিনার-২' শুক্র গ্রহের ৪১,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে রেডিওমিটার স্ক্যানিংয়ের সাহায্যে নাসার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে দেয়। এগুলি হল শুক্রের ভূপৃষ্ঠে তাপমাত্রা ৮০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটের ওপরে, আবহমণ্ডলে অক্সিজেন জলীয় বাষ্প এবং পৃথিবীর মতো প্রাণের সম্ভাবনা ওই গ্রহে নেই বললেই চলে। মেরিনার-২-এর ম্যাগনেটোমিটার আরও বিস্ময়কর একটি তথ্য জানিয়েছিল। শুক্রে পৃথিবীর মতো জটিল চৌম্বক পরিমণ্ডল নেই। এর কারণ, শুক্র নিজের অক্ষরেখাকে ঘিরে খুব ধীরগতিতে আবর্তিত হয়।

মেরিনার-২-এর এই চমকপ্রদ সাফল্য মেরিনার-১ -এর ব্যর্থতাকে ভুলিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, পৃথিবী থেকে ৮৬০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে মহাশূন্যে উড়ন্ত মেরিনার-২ আন্তর্গ্রহযানের সঙ্গে আমেরিকার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির ১২৯ দিন

মেরিনার-২-এর ম্যাগনেটোমিটার আরও বিস্ময়কর একটি তথ্য জানিয়েছিল। শুক্রে পৃথিবীর মতো জটিল চৌম্বক পরিমণ্ডল নেই। এর কারণ, শুক্র নিজের অক্ষরেখাকে ঘিরে খুব ধীরগতিতে আবর্তিত হয়।

একটানা যোগাযোগ ছিল। এই সাফল্যে উৎসাহিত নাসার মহাকাশবিজ্ঞানীরা ঠিক করেন, শুক্র অভিযানে পরবর্তী আন্তর্গ্রহযান মেরিনার-৫-কে এই গ্রহের ৪০০০ কিলোমিটারের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য আন্তর্গ্রহযানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটিয়ে এর তাপ সহন ক্ষমতা বাড়ানো হয়। সৌরকোষগুলিকে আরও শক্তপোক্ত করে তোলার পাশাপাশি শুক্রের উঁচু আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উপস্থিতির হার নিরূপণের জন্য বসানো হয় একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র।

মেরিনার-৫ পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৬৭ সালের ১৪ জুন। একটি শক্তিশালী অ্যাটলাস অ্যাজেনা রকেট ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি উৎক্ষেপণ

গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট টেকনিক

শুক্র থেকে মঙ্গলে যাওয়ার জন্য শুক্রের মহাকর্ষ-শক্তি ব্যবহারের যে প্রযুক্তি মেরিনার-১০'-এর ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল, মহাকাশবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে বলে 'গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট টেকনিক' বা 'মহাকর্ষ-শক্তি ব্যবহার প্রযুক্তি'। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীরা প্রথম ভেবেছিলেন ১৯২০ সালে, যখন মানুষের মহাকাশ অভিযান কল্পবিজ্ঞানের লেখকদের স্বপ্নে ছিল। ১৯৬০ সালে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিস্তারিত ছক তৈরি হয়। সৌরজগতের নিয়মে সূর্যের শক্তিই গ্রহগুলির আবর্তনের শক্তি হিসেবে কাজ করে। পৃথিবী থেকে পাঠানো আন্তর্গ্রহযান যখন একটি গ্রহের পাশ দিয়ে যায়, সাময়িকভাবে এর গতি বেড়ে যায় এবং যানের শক্তি খরচ বেশি হয়। আবার গ্রহটি পেরিয়ে গেলে গতি কমে আসে এবং চলার দিকও পরিবর্তিত হয়। এভাবেই একটি গ্রহ থেকে আর একটি গ্রহের দিকে যায় আন্তর্গ্রহযানটি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলে 'সেলেস্টিয়াল বিলিয়ার্ডস' বা মহাজাগতিক বিলিয়ার্ড খেলা। মহাকর্ষ শক্তি ব্যবহার প্রযুক্তির কাজে লাগিয়ে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিখুঁতভাবে একটি আন্তর্গ্রহযানকে পাঠাতে হলে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে যানের গতিপথ নির্ধারণ, বিশেষ করে 'ট্র্যাজেক্টরি' সঠিক হতে হবে।

কেন্দ্র থেকে একে মহাকাশে নিয়ে যায়। তিন অক্ষে নিয়ন্ত্রিত এই আন্তর্গ্রহযান ১৯ অক্টোবর শুক্রের ঠিকানায় পৌঁছয় এবং পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার উমেরায় অবস্থিত নাসার 'ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক ট্র্যাকিং স্টেশন'-এর বিজ্ঞানীদের নির্দেশ পেয়ে কম্পিউটার শুক্র সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতিকে চালু করে দেয়। এই অভিযান থেকেই প্রথম জানা গিয়েছিল, শুক্রের নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধ ৬০৫৩ কিলোমিটার (± ৪ কিলোমিটার) এবং শুক্রপৃষ্ঠে আবহমণ্ডলের চাপ ১০০ বার্‌স, যা খুবই বেশি।

পরপর দুই 'মেরিনার' আন্তর্গ্রহযানের সাফল্য আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের আত্মবিশ্বাসকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। নাসা ঠিক করে, পরবর্তী শুক্র অভিযানের জন্য মেরিনার-১০ আন্তর্গ্রহযান শুক্র অভিযানের পর মঙ্গলে যাবে। এর জন্য যানটি ব্যবহার করবে শুক্রের মহাকর্ষ-শক্তি এবং প্রতি সেকেন্ডে যানের সূর্যকেন্দ্রিক গতিবেগ কমিয়ে আনা হবে ৪.৪১ কিলোমিটারে। ফলে শুক্র থেকে মঙ্গলে যাত্রা শুরু করার জন্য যে পরিমাণ উৎক্ষেপণ শক্তির (লঞ্চ এনার্জি) প্রয়োজন তার দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি ব্যবহার করেই সম্ভব হবে এই কাজ সম্পূর্ণ করা।

অ্যাটলাস-সেন্টোর রকেটে চড়ে মেরিনার-১০ শুক্রের উদ্দেশ্যে কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯৭৩-এর ২ নভেম্বর। শুক্রপৃষ্ঠের ৫৭৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে যায় ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে। শুক্রের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় মেরিনার-১০ এই গ্রহের আলট্রাভায়োলেট প্রতিচ্ছবি পৃথিবীতে পাঠায়,এ ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজও শেষ করে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। জানা যায়, শুক্রের আবহমণ্ডলের ওপরের স্তরে অল্প পরিমাণে অ্যাটমিক হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম আছে। শুক্রের ৭,৬০,০০০ কিলোমিটার দূর থেকে মেরিনার-১০ এই গ্রহের ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ তারিখে যে সম্পূর্ণ ছবিটি তুলেছিল, তা এককথায় অসামান্য।

মেরিনার-১০ মঙ্গলে যেতে পেরেছিল কি না সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানা যায়নি। তবে মেরিনার শ্রেণীর আন্তর্গ্রহযান দিয়ে একই সঙ্গে মঙ্গল ও শুক্রে আলাদা-আলাদা অভিযান চালাবার পর, নাসা এই ধরনের ব্যয়বহুল মহাকাশযান ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তে তৈরি হয় কম খরচের নতুন ধরনের আন্তর্গ্রহযান 'পাইওনিয়ার' ও 'ভয়েজার'। ১৯৬০-এ আমেরিকা পরিকল্পনা করেছিল, পৃথিবী থেকে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে যত শীঘ্র সম্ভব সরাসরি আন্তর্গ্রহযান পাঠাবে। কিন্তু বাস্তবে কাজ শুরু করার পর যখন দেখা গেল ২১৫৫ সালের আগে এ-কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার নয় এবং যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা জোগাড় করা সহজ হবে না, নাসার মহাকাশবিজ্ঞানীরা কম খরচে মহাকাশ অভিযানের দিকে ঝুঁকলেন।

শুক্র অভিযানে 'পাইওনিয়ার ভেনাস-১' ও '২' আন্তর্গ্রহযান দুটি পৃথিবী থেকে উড়েছিল ১৯৭৮-এর মে ও অগস্ট মাসে। কিন্তু শুক্রে পৌঁছেছিল পাঁচদিনের তফাতে। ক্যালেন্ডারে তারিখ ছিল ১৯৭৮-এ ডিসেম্বর ৪ ও ডিসেম্বর ৯। এর আগে শুক্রে গিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার ১০টি ও আমেরিকার তিনটি মহাকাশযান। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, পাইওনিয়ার ভেনাস-১ প্রথম মহাকাশযান, যা শুক্রের কক্ষপথে এই গ্রহকে পরিক্রমা করেছিল এবং পাইওনিয়ার ভেনাস-২ শুক্রের আবহমণ্ডলে গবেষণা চালাবার জন্য একসঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল একাধিক অনুসন্ধানী ক্যাপসুল বা মডিউল, যাকে মহাকাশবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে 'প্রোব'।

পাইওনিয়ার ভেনাস-১ শুক্রের কক্ষপথে ২৪৩ দিন ঘুরে নির্ধারিত কাজ শেষ করে। এর পরেও ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কাজ করে গেছে এই আন্তর্গ্রহযান। সক্রিয় ছিল এতে বসানো ১২টি যন্ত্রপাতি।
প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সফল হওয়ার পর এই যানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শুক্রের পরিবেশের বিভিন্ন এলাকার তথ্য সংগ্রহের। ১১ বছর ধরে সৌর প্রতিক্রিয়া শুক্রপৃষ্ঠের ও এই গ্রহের আবহাওয়ায় কী ধরনের পরিবর্তন আনে সে-সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাঠিয়েছে পাইওনিয়ার ভেনাস-১।

অন্যদিকে ১৯৭৮-এর ৯ ডিসেম্বর মাত্র আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শুক্রের আবহমণ্ডলে চারটি প্রোব নামিয়ে পাইওনিয়ার ভেনাস-২ -এর মিশন সম্পূর্ণ করে। এই প্রোবগুলি শুক্রের আবহমণ্ডল দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে নীচের দিকে নেমেছিল। পাইওনিয়ার ভেনাস অভিযান দুটির তথ্য ব্যবহার করে প্রথম শুক্রগ্রহের ভূসাংস্থানিক মানচিত্র বা 'টোপোগ্রাফিক ম্যাপ' তৈরি হয়েছে।

'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট'
হিংসুটে দৈত্যও
WHAT DID OLD MRS. HALLETT ENJOY FROM HER WINDOW?

এবারের ক্লাস 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট' দিয়ে শুরু, 'দ্য সিলভার টি-পট' দিয়ে শেষ। আলোচনা করেছেন রণধীর ভট্টাচার্য

বন্ধু হয়ে ওঠে শিশুদের

ই ং রে জি

গত সংখ্যায় অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট' নিয়ে আলোচনা করতে-করতে মাঝপথে থামতে হয়েছিল আমাদের। এ-সংখ্যায় তাই আলোচনা শুরু করব ওখান থেকেই। সত্যি বলতে কী, গল্প হিসেবে 'দ্য সেলফিশ জায়ান্ট'-এর তুলনা হয় না। এত সরল-সহজ ভাষা, অথচ কী গভীর আবেদন গল্পটির। অস্কার ওয়াইল্ডের অনেক গল্পেই এই ব্যাপারটি দেখতে পাওয়া যায়। সহজ ভঙ্গীতে অত্যন্ত গভীর কথা তিনি বলতে পারেন অনায়াসে, তাই তিনি এত বড় লেখক। তাই তাঁর লেখায় হিংসুটে দৈত্যও শেষ পর্যন্ত বন্ধু হয়ে ওঠে পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের।

Read the following passage carefully and answer the questions set on it:

He saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they have covered themselves with blossoms and they were waving their arms gently above the children's heads. The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughed. It was a lovely scene; only in the corner of the garden it was still winter. It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to branches of the tree and he was wandering all around it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the North wind was blowing and roaring about it. "Climb up! little boy," said the tree and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny.

(A) (a) What wonderful sight did the giant see?

(b) Why did the trees cover themselves with blossoms?

(c) What were the birds doing?

(d) Why could not a little boy climb up the tree?

(B) Fill in the following chart with informations from the text:

Who/Which	Did what?	Why?
(i)	cried bitterly	(ii)
(iii)	(iv)	to have the children back again.
(v)	could not climb the tree	(vi)
The Giant	(vii)	It was long since he heard a bird sing.
(viii)	bent its branches	(ix)

(C) Find out the True and False statements:

(i) He saw an ordinary sight.

(ii) The children had crept in the garden through a little hole.

(iii) The birds were flying and twittering.

(iv) The Northwind ceased to blow.

(D) Find the synonyms of the following words from the text:

(i) Moved slowly, quietly or secretly.

(ii) Very small.

(iii) Charming.

(iv) Chirping.

Ans. A (a) The giant saw that the children had crept through a little hole into the garden. the trees blossomed into flowers and in every tree there was a little child.

(b) The trees covered themselves with blossoms because they were glad to see that the children had come back in the garden.

(c) The birds were flying and twittering with delight.

(d) The little boy was so tiny that he could not climb up the tree.

Ans. B (i) A boy.

(ii) He was unable to climb up the tree because he was so tiny.

(iii) The Giant.

(iv) Broke the wall.

(v) The little boy.

(vi) He was too small.

(vii) Jumped out.

(viii) The tree.

(ix) He let the boy climb up.

Ans. (C) (i) False.

Ans. (D) (i) Crept.
(ii) Tiny.
(iii) Wonderful.
(iv) Flase.
(ii) True.
(iii) True.
(iv) Twittering.

The Silver Teapot

Q.No. (2) Read the following passage carefully and answer the questions given below:

Old Mrs. Hallett enjoyed watching people from her window. She herself sat there at her tea-table pouring tea from a beautiful silver tea-pot. She looked out of the window and enjoyed people watching her pour tea from it. It gave her an opportunity to display the dearest of all her possession.

Mrs. Hallett was quite a friendly person in her neighbourhood. Her husband had died years ago leaving her this little house, a very small income and one son Robert. Mrs. Hallett never said to anyone that Robert had been rather a disappointment. She had gone without many things to send him to a good school and had given him everything she could. And then on his eighteenth birthday, he came and announced that he was going away to Canada. For some reason, he looked a little frightened, Mrs. Hallett thought.

"When will you go?" she asked, concealing her disappointment.

"Almost at once. Please don't ask me why?' Mrs. Hallett never liked to interfere with what her son wanted to do.

Robert had promised to take his mother to Canada but never did he ask her to go there. At first letters used to come with demands for money and then these stopped altogether.

Answer briefly:

Q. A. (a) What was the dearest possession of old Mrs. Hallett?
(b) What did she enjoy from her window?
(c) What did her husband leave for her at the time of his death?
(d) What did Mrs. Hallett do to send her son to a good school?
(e) Did Robert satisfy his mother's wish?
(f) When did Robert tell his mother that he was going away to Canada?

Q. B. Find out the True and False statements:

(i) Old Mrs. Hallett did not enjoy watching people from her window.
(ii) The Silver-tea-pot was the dearest possession of Mrs. Hallett.
(iii) Robert had not disappointed his mother.
(iv) On his eighteenth birth-day Robert announced that he was going to Canada.

Q. C. Give the synonyms of the following words from the text:

(i) Observe.
(ii) Agreeable.
(iii) Oppose.
(iv) Hiding.

Ans. A. (a) The dearest possession of Mrs. Hallett was a Silver tea-pot.
(b) She enjoyed people watching her pour tea from a Silver tea-pot.
(c) Her husband had left a little house, a very small income and one son Robert.
(d) Mrs. Hallett had gone without many things to send her son to a good school.
(e) No. Robert was rather a disappointment to his mother.
(f) On his eighteenth birth-day Robert told his mother that he was going to Canada.

Ans. B. (i) False.
(ii) True.
(iii) False.
(iv) True.

Ans. C. (i) Watch.
(ii) Friendly.
(iii) Interfere.
(iv) Concealing.

Q. No. (3) Read the following passage carefully and answer the questions set on it:

Life had made Mrs. Hallett patient and she did not complain. But she felt uncomfortable when her friends asked her if she had heard from Robert lately. It was hard to say 'No.' as she was basically a very truthful woman. But she invented exciting things and said that her son had written these in his letters. She would buy herself some little things like a new handbag or a woollen shawl and say Robert had sent that to her as a present.

And she said something like that to her friends about the silver tea-pot. She had actually found it in a jeweller's shop in Southampton and inspite of its high price decided to buy it. It was made in the eighteenth century when George III was King. The next day she invited a special friend to tea and the tea-pot was brought out as Robert's birth day gift to his mother. How proud she felt as she poured tea from it.

Answer briefly:

Q. No. A. (a) Why did Mrs. Hallett feel uncomfortable when her friends asked if she had heard from Robert?
(b) What type of lady was Mrs. Hallett?
(c) Why did she invent exciting things about her son?
(d) Where from did Mrs. Hallett buy the beautiful silver tea-pot?

Q. No. B. Give the synonyms of the words from the text.

(i) Recently.
(ii) Uncomfortable.
(iii) Distinguished.
(iv) Presentation.

Q. No. C. Find out the True and False statements.

(i) Mrs. Hallett bought the silver tea-pot from a jeweller's shop in London.
(ii) She felt uncomfortable when her friends asked her it Robert had written to her.
(iii) The silver tea-pot was made in nineteenth century.
(iv) Mrs. Hallett felt proud when she poured tea from the silver tea-pot.

(লেখক হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক)

প্রি-টেস্ট হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথম অ্যাসিড টেস্ট। এখান থেকেই বোঝা যাবে কার প্রস্তুতি ঠিক কোন জায়গায়। জানিয়েছেন
সুদেব মুখোপাধ্যায়

প্রি-টেস্টই বলবে, মাধ্যমিকের প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত

ই তি হা স

এর আগে একটি সংখ্যায় আমরা গত ১০ বছরের অবজেকটিভ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। জায়গার অভাবে '৯৮, '৯৯ এবং ২০০০ সালে মাধ্যমিকে আসা অবজেকটিভ প্রশ্নের উত্তরগুলি প্রকাশ করা যায়নি। এবার আমরা সেগুলি আলোচনা করতে চাই। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশন সংক্রান্ত একটি বড় প্রশ্নের উত্তর কেমন হওয়া উচিত, তা-ও থাকবে আমাদের আলোচনায়। আর থাকবে গান্ধার শিল্প ও ফা হিয়েনের ভারত ভ্রমণ-বিষয়ক বর্ণনা নিয়ে দুটি টীকা। নানা ধরনের এই প্রশ্নগুলি একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়ার অর্থ হল, তোমাদের আসন্ন প্রি-টেস্ট পরীক্ষায় এগুলি কাজে লাগতে পারে। মনে রেখো, প্রি-টেস্ট পরীক্ষাই হল মাধ্যমিকের প্রথম স্টেজ-রিহার্সাল। প্রি-টেস্টই বলে দেবে, তোমাদের প্রস্তুতি এখন ঠিক কোন্ পর্যায়ে, আর মাধ্যমিকের আগে তা কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। বলতে পারো, এই পরীক্ষাই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথম 'অ্যাসিড টেস্ট'।

মাধ্যমিক / ইতিহাস - ১৯৯৮

ক) 'রাজতরঙ্গিনী' কে লিখেছিলেন?
উঃ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কহ্লণ।
খ) আলেকজান্ডার কোন দেশের রাজা ছিলেন?
উঃ গ্রিস।
গ) সন্ধ্যাকর নন্দী কে ছিলেন?
উঃ 'রামচরিতমানস'-এর রচয়িতা।
ঘ) চোল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকের নাম লেখো।
উঃ প্রথম রাজেন্দ্র চোল।
ঙ) তরাইনের প্রথম যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিলেন?
উঃ গজনির অধিপতি মহম্মদ ঘুরি।
চ) প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন?
উঃ লোদি বংশের সুলতান ইব্রাহিম লোদি।
ছ) ১৭৩৯ সালে কে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন?
উঃ পারস্যের অধিপতি নাদির শাহ।
জ) বক্সারের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল?
উঃ ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে।
ঝ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেছিলেন?

মাধ্যমিক / ইতিহাস - ১৯৯৯

ক) 'অর্থশাস্ত্র'-র রচয়িতা কে?
উঃ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য।
খ) 'নাসিক প্রশস্তি'-তে কোন রাজার কীর্তি বর্ণিত হয়েছে?
উঃ সাতবাহন বংশের রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর।
গ) শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায়)।
ঘ) কোন পহ্লব রাজার আমলে মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল?
উঃ রাজা নরসিংহ বর্মনের আমলে।
ঙ) কোন বছর থেকে সুলতানি আমল আরম্ভ হয়েছিল?
উঃ ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে।
চ) শিখদের শেষ গুরু কে ছিলেন?
গুরু গোবিন্দ সিংহ।
ছ) কোন বছর তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল?
উঃ ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে।
জ) কোন মুঘল সম্রাট ইংরেজ কোম্পানিকে 'দেওয়ানি' অধিকার দিয়েছিলেন?
উঃ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম।
ঝ) শেষতম পেশোয়া কে ছিলেন?
উঃ দ্বিতীয় বাজিরাও।
ঞ) কোন বছর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছিল?
উঃ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে।
ট) 'পথের দাবী' কে রচনা করেছিলেন?
উঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
ঠ) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কোন সালে ঘটেছিল?
উঃ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল।
ড) 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?
উঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
ঢ) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে হয়েছিলেন?
উঃ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

মাধ্যমিক / ইতিহাস - ২০০০

ক) হরপ্পা কোথায় অবস্থিত?
উঃ পশ্চিম পঞ্জাবের (বর্তমান পাকিস্তান) অন্তর্গত মন্টগোমারি জেলায়।

খ) হর্ষচরিতের রচয়িতা কে?
উঃ কবি বাণভট্ট।
গ) বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
উঃ বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক।
ঘ) সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি নাম কী?
উঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী।
ঙ) মেগাস্থিনিস কে ছিলেন?
উঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় আগত গ্রিক দূত।
চ) ভারত সম্বন্ধে অলবিরুনির লেখা গ্রন্থটির নাম কী?
উঃ তহকিক্-ই-হিন্দ' বা 'কিতাব-উল্-হিন্দ'।
ছ) তালিকোটার যুদ্ধ কোন বছর সংঘটিত হয়েছিল?
উঃ ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে।
জ) আদিনা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
উঃ বাংলার পাণ্ডুয়ায়।
ঝ) বান্দা বৈরাগি কে?
উঃ গুরু গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পূর্বে মাধোদাস নামে এক বৈরাগি সাধুকে শিখধর্মে দীক্ষিত করে তাঁর নামকরণ করেন বান্দা সিংহ বা বান্দা বাহাদুর। কিন্তু পরবর্তী দিনে মুঘলদের হাতে তিনি বন্দি হন, এবং সম্রাট ফারুখশিয়ারের আদেশে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে হাতির পায়ের তলায় পিষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।
ঞ) হিন্দু কলেজ কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
উঃ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে।
ট) 'বর্তমান ভারত' কার রচনা?
উঃ স্বামী বিবেকানন্দের।
ঠ) ভগৎ সিংহ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলটির নাম কী ছিল?
উঃ 'নওজীবন ভারত সভা'।
ড) কাকে নব্যবাঙলা চিত্রকলা রীতির অগ্রদূত বলা হয়?
উঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।
ঢ) ভারতের সংবিধান কোন বছর থেকে কার্যকর হয়েছে?
উঃ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি।

গান্ধার শিল্প

মৌর্য সাম্রাজ্যের শেষপর্বে ভারতবর্ষে গ্রিক আক্রমণের পরোক্ষ ফল-স্বরূপ গান্ধার শিল্পের উদ্ভব ঘটে। গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পকলার সমন্বয়ে উত্তর ভারতের গান্ধার, অমরাবতী, মথুরা ও সারনাথ প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের বিকাশ ঘটে। ব্যাকট্রীয় গ্রিকগণ এই শিল্পরীতির সূচনা করলেও শক ও কুষাণযুগ পর্যন্ত এই ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল। বস্তুত কুষাণযুগেই, বিশেষত কনিষ্কের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, গান্ধার শিল্প সর্বাধিক প্রসার লাভ করে।

গান্ধার শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রিক বা রোমান রীতিতে বুদ্ধের বিভিন্ন মূর্তি গঠন করা। প্রাচীন গ্রিক দেবতা অ্যাপোলোর দেহ ছিল পেশিবহুল, চুল কোঁকড়ানো ও দৃঢ় চোয়াল। মূর্তিগুলি ছিল সাহস, শক্তি ও পৌরুষের প্রতীক। এই মূর্তির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করা হলেও, চক্ষু, ওষ্ঠ ও মুখমণ্ডলে ভারতীয় কমনীয়তা ও আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করা হত। যে-কারণেই ঐতিহাসিকরা যথার্থই বলেছেন, "গান্ধার রীতির ভাস্করের হৃদয় ছিল ভারতীয় আর হাত দুখানি গ্রিক।"

অনেকে মনে করেন এই শিল্প ছিল যান্ত্রিক একঘেয়েমিতে আক্রান্ত। এতে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না। মার্শালের মতে, গান্ধার শিল্প ছিল অনুকরণের অনুকরণ। তাই এর কোনও স্থায়ী প্রভাব ছিল না। তথাপি ভারতীয় বিষয়বস্তুতে পাশ্চাত্য রীতির প্রয়োগের পরীক্ষা গান্ধার শিল্পে প্রত্যক্ষ করা যায়।

ফা হিয়েনের বিবরণ

সুপ্রাচীন কাল থেকে যে সকল বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছিল, ফা হিয়েন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চিনা পর্যটক কুঙ্গ ওরফে ফা হিয়েন ভারত পরিভ্রমণে আসেন। তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বৌদ্ধ তীর্থস্থান পরিদর্শন এবং বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করা। দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সম্যক অভিজ্ঞতাস্বরূপ তিনি 'কো কুয়ো কিং' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন।

ফা হিয়েনের বিবরণে ভারতের আর্থ-সামাজিক তথা শাসনতান্ত্রিক জীবনের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সে-যুগের সামাজিক জীবন ছিল উন্নত। চুরি-ডাকাতির উপদ্রব ছিল না। মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করত। সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব থাকলেও বৌদ্ধরাও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বিশেষ ছিল না।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করে ফা হিয়েন বলেছেন যে, সরকারি কর্মচারীরা মানুষের দৈনন্দিন কাজে হাত দিত না। সরকারি আইন ছিল উদার, অধিকাংশ অপরাধে শাস্তি ছিল জরিমানা। তিনি ভারতের অপরাপর নগরের মধ্যে পাটলিপুত্র নগরকে শ্রেষ্ঠ নগর বলে অভিহিত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ফা হিয়েনের বিবরণ অনেকাংশে কল্পনাপ্রসূত। কারণ তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তথাপি ফা হিয়েনের বিবরণ গুপ্তযুগ-বিষয়ক একটি আকর গ্রন্থ।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রধান প্রস্তাবগুলি কী কী? এই প্রস্তাবগুলির রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জটিল পরিস্থিতি, আজাদ হিন্দ ফৌজের ধৃত সৈনিকদের বিচারকে কেন্দ্র করে গণ-ক্ষোভ, ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনা স্বাভাবিক ভাবেই ব্রিটিশ সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ভারতের এমত উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির চটজলদি সমাধানকল্পে ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শীঘ্রই একটি মন্ত্রীমিশন ভারতে পাঠানো হবে।

সদস্যবর্গ : প্রস্তাবিত এই মিশনের সদস্যরা হলেন ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সভার সভাপতি সার ষ্ট্যাফোর্ডক্রিপ্স, ও নৌ-বাহিনীর প্রধান এ, ভি. আলেকজান্ডার। ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ এই মন্ত্রী মিশনের সদস্যরা দিল্লিতে উপস্থিত হন।

পটভূমি : মন্ত্রী মিশন ভারতে বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। তবে মূল আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল কংগ্রেস ও লিগের সঙ্গে। লিগের পক্ষে জিন্না ও কংগ্রেসের পক্ষে আজাদ কথাবার্তা চালান। জিন্নার দাবি ছিল পৃথক পাকিস্তান গঠন। অপর পক্ষে, কংগ্রেসের দাবি ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র। সুতরাং মন্ত্রী মিশনের পরস্পরবিরোধী দুইটি প্রধান দাবির মধ্যে ভারসাম্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। যাই হোক, মন্ত্রী মিশন কংগ্রেস ও লিগ—উভয় পক্ষের বক্তব্য খুঁটিয়ে দেখার পর নিজস্ব একটি প্রস্তাব পেশ করে।

মিশনের প্রস্তাব : এই প্রস্তাবে বলা হল স্বাধীনতার পরে ভারত হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য এর অন্তর্ভুক্ত হবে।
খ) প্রস্তাবিত এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা ও সরকার থাকবে।
গ) সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগদান করতে পারবেন।
ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও যোগাযোগ।

এই কয়েকটি বিষয় ছাড়া বাকি সমস্ত বিষয়ে দায়িত্ব থাকবে প্রাদেশিক আইনসভা ও সরকারের হাতে। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। ছটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ (মুম্বই, চেন্নাই, বিহার, ওড়িশা, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ) থাকবে প্রথম ভাগে। দ্বিতীয় ভাগে থাকবে তিনটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র—পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু, তৃতীয় ভাগে থাকবে বাংলা ও অসম। নতুন ব্যবস্থা অনুসারে নির্বাচনের পর যে কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করলে জোট বাধতে পারবে। আরও স্থির হয় হয় যে, নতুন সংবিধান চালু না হওয়া পর্যন্ত একটি জাতীয় অন্তর্বর্তী সরকার

গঠন করা হবে। সংবিধান সভার সংবিধান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হলে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক : মন্ত্রী মিশন কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করার পর এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। সামগ্রিক ভাবে এই প্রস্তাবে হিন্দু, মুসলমান পরস্পর বিরোধী ও অনমণীয় দাবিগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া করে দেওয়া হয়। আর তাই বি এন পান্ডে বলেন যে, "The Cabinet mission plan was the best that could be devised to maintain the unity of India at the critical period in Indian history" তবে তাই বলে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ত্রুটিমুক্ত ছিল এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রাদেশিক সরকারের তুলনায় দুর্বল করার ফলে প্রস্থাবিত যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো অনেকটা কমজোরি ও দুর্বল হয়ে যায়। এ ছাড়াও আলোচ্য এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে ভারত বিভাগের সম্ভাবনাকে প্রকটক রে তোলা হয়। অবশ্য, এই প্রস্তাবের সাফল্য বা ব্যর্থতা সবটুকুই নির্ভর করছিল কংগ্রেস ও লিগের সদিচ্ছার ওপর।

প্রতিক্রিয়া : মন্ত্রী মিশন সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা অস্পষ্ট ও মিশ্র। যেভাবে প্রদেশগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, কংগ্রেস তা সমর্থন করেনি। এ ছাড়াও, সাংবিধানিক সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীর ওপর নিয়ন্ত্রণ কংগ্রেস পছন্দ করেনি। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেস'ও লিগকে প্রায় সমান মর্যাদা দেওয়ায় কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তবুও, কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের অংশটুকু ছাড়া মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব মেনে নেয়।

লিগ অবশ্য আগেই এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী পর্বে কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নেহরু ঘোষণা করেন যে, সংবিধান সভায় অংশগ্রহণ ছাড়া কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা মানতে বাধ্য নয়। নেহরুর এই ঘোষণায় জিন্না ক্ষোভে ও ক্রোধে মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন না বলে জানালেন এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। এইভাবে, মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতিতে রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার অধ্যায়ের সূচনা হয়।

(লেখক আমতা পীতাম্বর হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক)

এসে গিয়েছে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। পরীক্ষার আগে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য বীজগণিতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছেন **প্রশান্তকুমার বসু**

এবারের বিষয় অসমীকরণের লেখচিত্র

অঙ্ক

বীজগণিতের যে অংশগুলি আমরা আলোচনা করিনি তার মধ্যে অসমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান এবং করণী নিয়ে সারাংশভিত্তিক আলোচনা করা হল। বিশদ আলোচনা পরে নিশ্চয়ই করা হবে।

আগে সরল সমীকরণ এবং সহসমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছিল। তার সঙ্গে অল্প কয়েকটি বিষয় জুড়ে দিলেই হয়ে যাবে অসমীকরণের লেখচিত্র। সপ্তম শ্রেণীতে তোমরা সংখ্যারেখা এবং সংখ্যারেখার চিহ্নযুক্ত রাশির যোগ-বিয়োগ-গুণ শিখেছ। এবার সংখ্যারেখার জ্ঞানটুকু বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে। প্রথমে চিত্রের সাহায্যে সংখ্যারেখায় $x>2$, $y\geq 5$, $x\geq -3$, $y>-2$, $x\leq 5$, $y\leq -3$ ইত্যাদি নির্ণয় করা জানব। চিত্র (ক)-তে, অনুভূমিক ভাবে XOX' সংখ্যারেখাটি নেওয়া হল এবং একই একক নিয়ে 1, 2, 3 ..., ... −3, −25, অঙ্কিত করা হল।

(চিত্র ক)

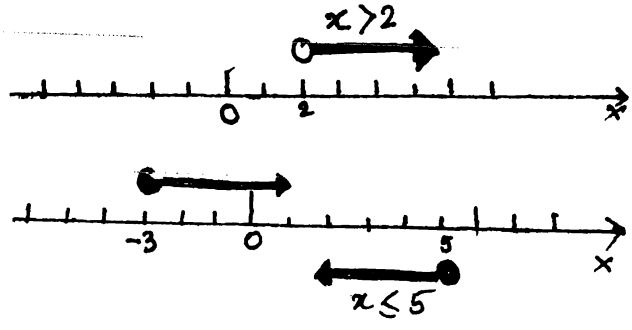

$x>2$ অর্থ, x-এর মান 2 নয়, ঠিক 2-এর বেশি।

$x\geq -3$ অর্থ, x-এর মান −3-এর সমান এবং −3 থেকে বেশি।

চিত্রে $x\neq 2$, $x>2$ বলতে সংখ্যারেখায় 2 বিন্দু ছাড়া, 2-এর বেশি যে কোনও বিন্দু বোঝায়। ঠিক তেমনই $x\leq 5$ বলতে XOX'-তে 5 এবং 5-এর কম সকল বিন্দু অবস্থানকে বোঝায়।

অনুরূপে উলম্বভাবে YOY' এঁকে শর্তানুযায়ী y-এর মান বসিয়ে তা নির্ণয় করতে হয়।

x>2-এর অসমীকরণের লেখচিত্র আঁকতে বললে, প্রথমে আমরা x =2 -এর লেখচিত্র (AB) অঙ্কন করব। এরপর x>2 বলতে, AB রেখার ডানপার্শ্ব ও AB রেখা ছাড়া (রেখাঙ্কিত) অঞ্চলকে বোঝানো হবে।

(চিত্র খ)

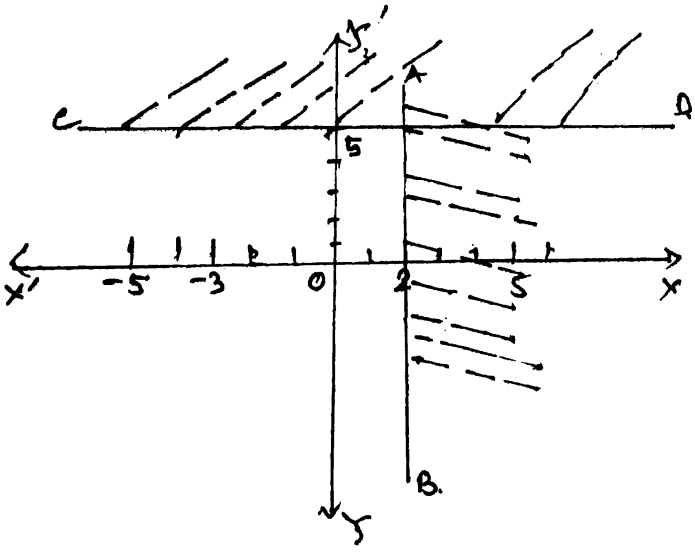

অনুরূপে y≥5 অসমীকরণের লেখচিত্র হবে, CD রেখার ওপরের অংশ, CD রেখাসমেত অঞ্চল।

3x+4y ≥ 12 অসমীকরণের অঞ্চল রেখাঙ্কিত করো।

ছক অনুযায়ী প্রথমে 3x+4y = 12 সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্ক করো।

x	4	0	8
y	0	3	−3

(চিত্র গ)

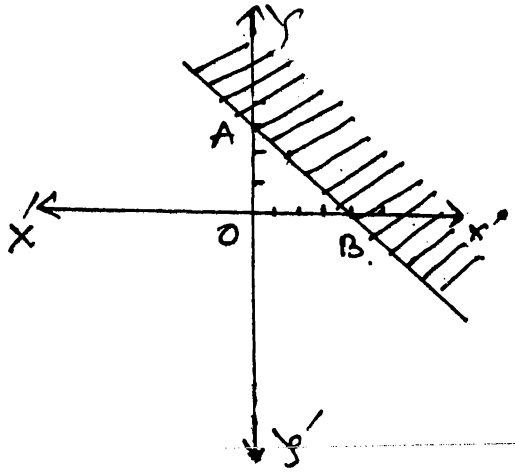

মনে করো রেখাটি AB

এখন অসমীকরণ, ছক এবং চিত্র থেকে দ্যাখো, y=0 হলে x≥4 হবে। অর্থাৎ বিন্দুগুলি B বিন্দুর ডানদিকে হবে। সুতরাং অসমীকরণটির অঞ্চল হবে AB রেখার ডানদিক AB রেখা সমেত।

প্রশ্নে, একই ছক কাগজে একাধিক অসমীকরণের অঞ্চল এঁকে তাদের সাধারণ অঞ্চল নির্ণয় করতে বলা হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি অসমীকরণের অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে রেখাঙ্কিত করতে হবে যাতে সমাধান অঞ্চলটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন x≥3, y≤4-এর সমাধান অঞ্চল নির্ণয় করো।

চিত্র থেকে পাই, নির্ণেয় সমাধান অঞ্চল ∠DEB-এর অন্তর্গত অংশ। এরকমের তিনটি অসমীকরণের সাধারণ অঞ্চলও নির্ণয় করা সম্ভব।

(চিত্র ঘ)

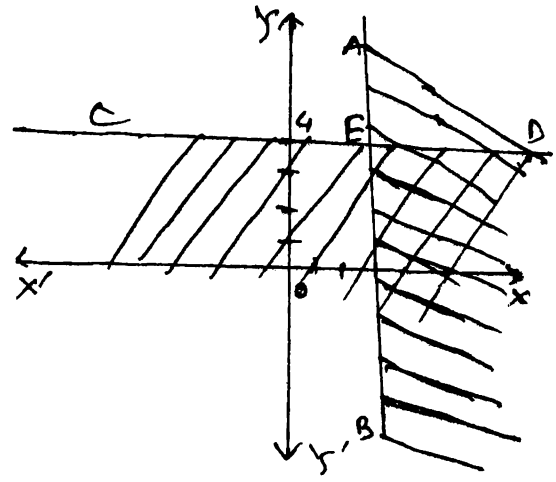

কয়েকটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

প্রঃ $12 \le 3x+4 \le 30$ হলে x-এর সমাধান নির্ণয় করো।

উঃ $8 \le 3x \le 26$

বা, $2\frac{2}{3} \le x \le 8\frac{2}{3}$ (নির্ণেয় সমাধান)

প্রঃ $12 \le 3x+4 \le 30$ এবং x একটি জোড় সংখ্যা হলে, x-এর সমাধান করো।

উঃ $2\frac{2}{3} \le x \le 8\frac{2}{3}$

∴ নির্ণেয় সমাধান $x = \{4, 6, 8\}$

প্রঃ $-5 \le 4-3x \le 10$ এবং x একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা

উঃ $-9 \le -3x \le 6$

$3 \ge x \ge -2$

$\therefore x = \{3, 2, 1\}$

দ্রষ্টব্য, কোনও অসমীকরণকে '—চিহ্নযুক্ত' কোনও রাশি দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে অসমীকরণের চিহ্ন উল্টে যায় অর্থাৎ x≥−3 হলে −x≤3 হবে ইত্যাদি।

প্রঃ $\frac{1}{2} > \frac{1}{x} > \frac{1}{3}$ হলে x-এর সমাধান করো।

উঃ $2 < x < 3$

দ্রষ্টব্য, অসমীকরণের উভয়পক্ষের অন্যোন্যক করলে, অসমীকরণের চিহ্ন পাল্টে যায়। অসমীকরণের আলোচনা পরে আবার করব।

দ্বিঘাত সমীকরণ

সমীকরণে চলরাশির বৃহত্তম ঘাত 2 হলে, তাকে দ্বিঘাত সমীকরণ বলে। যেমন $x^2+9x+20 = 0$, $4x^2+4x+1 = 5$. এই সমীকরণ সমাধানে x-এর দুটি করে মান পাওয়া যায়।

প্রঃ সমাধান করো

উঃ $x^2+9x+20 = 0$

বা $(x+4)(x+5) = 0$

∴ হয় $x+4 = 0$ বা $x+5 = 0$

অর্থাৎ $x = -4$ বা $x = -5$

এক্ষেত্রে x-এর মান −4 বা −5 হলে সমীকরণটি সিদ্ধ হয়। প্রতিটি অঙ্ক করার শেষে x-এর প্রাপ্ত মানগুলিকে সমীকরণে বসিয়ে দেখে নেবে, যেন সেগুলি সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে। কোনও-কোনও ক্ষেত্রে 4-ঘাত বা

6-ঘাত বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধান করতে হয়। তখন আমরা ওই ধরনের সমীকরণগুলিকে দ্বিঘাত সমীকরণে প্রকাশ করে করব। যেমন,
$y^4+9y^2+20=0$ বা $x^2+9x+20=0$ ... ($y^2=x$ ধরে পাই) ইত্যাদি।
প্রঃ $x^2(a+b)-2ax+(a-b)=0$ সমাধান করো।
উঃ বা, $x^2(a+b)-(a+b)x-(a-b)x+(a-b)=0$
বা, $x(a+b)(x-1)-(a-b)(x-1)=0$
বা, $(x-1)\{(a+b)x-(a-b)\}=0$ ...
প্রঃ $1/(x+1)+2/(x+5)=\frac{1}{2}$ ... ('92)
উঃ $[(x+5)+2(x+1)]/(x+1)(x+5)=\frac{1}{2}$
বা, $2(3x+7)=x^2+6x+5$
বা, $x^2=9$, বা, $x=\pm3$
x-এর মান +3 এবং −3 প্রশ্নে বসিয়ে, উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হও।
প্রঃ $\frac{a}{3}+\frac{3}{x}=3\frac{1}{3}$ ... ('99)
উঃ বা, $a+\frac{1}{a}=3+\frac{1}{3}$ [$\frac{a}{3}=a$ ধরে পাই]
বা, $(a-3)+(1/a-1/3)=0$
বা, $(a-3)+(3-a)/3a=0$
বা, $(a-3)(1-1/3a)=0$
$\therefore a=3$ বা $1/3$
$\therefore x=9$ বা 1.
প্রঃ $1/(x-2)(x-3)+1/(x-3)(x-4)=1/4$
উঃ বা, $1/(x-3)-1/(x-2)+1/(x-4)-1/(x-3)=1/4$
বা, $1/(x-4)-1/(x-2)=1/4$ ... ইত্যাদি
প্রঃ $1/(a+b+x)=1/a+1/b+1/x$ ... ('96T)
উঃ বা, $1/(a+b+x)-1/x=1/a+1/b$
বা, $-(a+b)/x(a+b+x)=(a+b)/ab$
বা, $-1/ax+bx+x^2=1/ab$
বা, $x^2+ax+bx+ab=0$ ... ইত্যাদি
যখন রাশিমালাটিকে সহজে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা যায় না তখন রাশিমালাটিকে পূর্ণবর্গে প্রকাশ করে করতে হয়। যেমন,
প্রঃ $x^2-14x+10=0$
উঃ বা, $x^2-2.x.7+49+10-49=0$
বা, $(x-7)^2=39$
বা, $x-7=\pm\sqrt{39}$
$\therefore x=7\pm\sqrt{39}$
সরল একঘাত সমীকরণ, একঘাত সহসমীকরণ, দ্বিঘাত সমীকরণ সংক্রান্ত প্রশ্নের অঙ্কের আলোচনা এই মুহূর্তে বাদ রাখলাম। কারণ প্রশ্নের শর্তগুলিকে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করার পর অঙ্কগুলি ঠিক আগের মতো করতে হয়।

করণী

করণী সংক্রান্ত আলোচনা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে নিশ্চয়ই আছে। পরীক্ষার জন্য কয়েকটি বিশেষ আলোচনা করব।
প্রঃ মানের ঊর্ধ্বক্রমানুসারে সাজাও :
$\sqrt{2}, 3\sqrt{3}, 4\sqrt{4}$

উঃ $\sqrt{2}=2^{1/2}=2^{6/12}=12\sqrt{64}$
$3\sqrt{3}=3^{1/3}=3^{4/12}=12\sqrt{81}$
$4\sqrt{4}=4^{1/4}=4^{3/12}=12\sqrt{64}$
এখানে যে দুটি রাশির মান সমান হয়েছে সেগুলি একসঙ্গে অবস্থান করবে যেমন, $(\sqrt{2}, 4\sqrt{4}), 3\sqrt{3}$
পদ্ধতি : করণীগুলিকে প্রথমে আমরা ঘাত-এ প্রকাশ করলাম। এরপর ঘাত-এর হরগুলিকে সমান করে রাশিগুলিকে একই আকারের করণীতে প্রকাশ করা হল।
প্রঃ $\sqrt{4}+\sqrt{11}, \sqrt{5}+\sqrt{10}, \sqrt{6}+\sqrt{9}$-কে মানের ঊর্ধ্বক্রমানুসারে সাজাও :

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক সম্পাদিত
by A Group of 20 Paper Setters
মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই
MADHYAMIK ENGLISH SAHAYIKA
মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা
মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা
মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা
মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা
গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই মাধ্যমিকে লেটার মার্কস পেতে হলে বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান সহায়িকা
মাধ্যমিক ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা
মাধ্যমিক ঐচ্ছিক মৎসচাষ সহায়িকা
প্রতিভা
স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী
১৮, ডঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ৩৫০-৯৩৫১, ৩৫২-৬৭১২
PRASA/2000

উঃ $(\sqrt{4}+\sqrt{11})^2 = 4+11+2.\sqrt{4}.\sqrt{11} = 15+2\sqrt{44}$
$(\sqrt{5}+\sqrt{10})^2 = 5+10+2.\sqrt{5}.\sqrt{10} = 15+2\sqrt{50}$
$(\sqrt{6}+\sqrt{9})^2 = 6+9+2.\sqrt{6}.\sqrt{9} = 15+2\sqrt{54}$
রাশিগুলিকে পূর্ণবর্গাকারে প্রকাশ করার পর $2\sqrt{a.b}$ পদগুলি পর্যবেক্ষণ করে ছোট-বড় নির্ণয় করা হয়। (কারণ a^2+b^2 পদসমষ্টি সকল ক্ষেত্রে 15)

প্রঃ $\sqrt{8}-\sqrt{5}, \sqrt{10}-\sqrt{4}, \sqrt{20}-\sqrt{2}$-কে মানের নিম্নক্রমানুসারে সাজাও :
উঃ $(\sqrt{8}-\sqrt{5})^2 = 8+5 -2\sqrt{8}\sqrt{5} = 13-2\sqrt{40}$
$(\sqrt{10}-\sqrt{4})^2 = 10+4 -2\sqrt{10}\sqrt{4} = 14-2\sqrt{40}$
$(\sqrt{20}-\sqrt{2})^2 = 20+2 -2\sqrt{20}\sqrt{2} = 22-2\sqrt{40}$
রাশিগুলিকে পূর্ণবর্গাকারে প্রকাশ করে a^2+b^2 পদসমষ্টি পর্যবেক্ষণ করে ছোট-বড় নির্ণয় করা হয়। (কারণ 2ab পদটি সকল ক্ষেত্রে $2\sqrt{40}$)

প্রঃ সরল করো :
$\sqrt{5}+(\sqrt{3}+\sqrt{2}) - 3\sqrt{3} \div (\sqrt{5}+\sqrt{2}) + 2\sqrt{2} \div (\sqrt{5}+\sqrt{3})$ ... ('87)
উঃ প্রথম অংশ $= \sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \div (\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
$= \sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$
অনুরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশগুলির হর থেকে করণী দুর করতে হবে। যদি হর a+b আকারে থাকে তবে তাকে a−b দিয়ে গুণ করে, হরকে করণীমুক্ত করতে হবে।
এইভাবে রাশিমালা $= \sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2}) - 3\sqrt{3}(\sqrt{5}-\sqrt{2})/_3 + 2\sqrt{2}(\sqrt{5}-\sqrt{3})/_2$
$= \sqrt{15}-\sqrt{10}-\sqrt{15}+\sqrt{6}+\sqrt{10}-\sqrt{6} = 0$ হবে

প্রঃ $\sqrt{2}(2+\sqrt{3}) + \sqrt{3}(\sqrt{3}+1) - \sqrt{2}(2-\sqrt{3}) + \sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$ ... ('89)
উঃ $= \sqrt{2}/\sqrt{3}\ \{(2+\sqrt{3})(\sqrt{3}-1) - (2-\sqrt{3})(\sqrt{3}+1)\} \div (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$
$= \sqrt{2}/\sqrt{3}\ (2\sqrt{3}-2+3-\sqrt{3}-2\sqrt{3}-2+3+\sqrt{3}) + 2$
= ... ইত্যাদি

কোনও প্রশ্নে করণীর বর্গমূল নির্ণয় করে করতে হয়।
যেমন $5+2\sqrt{6}$-এর বর্গমূল নির্ণয়
$5+2\sqrt{6} = \sqrt{3}^2+\sqrt{2}^2+2.\sqrt{3}.\sqrt{2} = (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$
∴ $5+2\sqrt{6}$-এর বর্গমূল $= \sqrt{3}+\sqrt{2}$

প্রঃ $x = \sqrt{3}/_2$ হলে $(\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x})/(\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x})$-এর মান নির্ণয় করো। ('86)
উঃ $\sqrt{1+x} = \sqrt{1+\sqrt{3}/_2} = \sqrt{(2+\sqrt{3})/_2} = \sqrt{(4+2\sqrt{3})/_4}$
$= \sqrt{[\sqrt{3}^2+(1)^2+2.\sqrt{3}.1]/_4} = \sqrt{(\sqrt{3}+1)^2/_4} = (\sqrt{3}+1)/_2$
অনুরূপে $\sqrt{1-x} = (\sqrt{3}-1)/_2$
এরপর মান বসিয়ে রাশিমালাটিকে সরল করতে হবে।

প্রঃ $x = (\sqrt{a+2}+\sqrt{a-2})/(\sqrt{a+2}-\sqrt{a-2})$ হলে প্রমাণ করো যে, $a = x+1/_x$ ('94T)
উঃ $(x+1)/(x-1) = \sqrt{a+2}/\sqrt{a-2}$ (যোগভাগ প্রক্রিয়া করে পাই)
প্রদত্ত রাশিমালার ডানদিকের অংশের লব ও হরের মধ্যে সম্পর্ক দেখে যোগভাগ প্রক্রিয়া করতে হয়।
∴ $(x^2+2x+1)/(x^2-2x+1) = (a+2)/(a-2)$ (বর্গ করে পাই)
আবার যোগভাগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সরল করো ...

প্রঃ $x = (\sqrt{3}+1)/(\sqrt{3}-1),\ y = (\sqrt{3}-1)/(\sqrt{3}+1)$ হলে, $(x^2-xy+y^2)/(x^2+xy+y^2)$ এবং (x+y) -এর মান নির্ণয় করো ... ('88)
উঃ $x+y = (\sqrt{3}+1)/(\sqrt{3}-1) + (\sqrt{3}-1)/(\sqrt{3}+1)$
$= [(\sqrt{3}+1)^2+(\sqrt{3}-1)^2]/(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)$
$= 2(\sqrt{3}^2+1^2)/_2 = 4$
এবং xy = 1
$(x^2-xy+y^2)/(x^2+xy+y^2) = [(x+y)^2-3xy]/[(x+y)^2-xy]$ ... ইত্যাদি

প্রঃ $x = (\sqrt{a+2b}+\sqrt{a-2b})/(\sqrt{a+2b}-\sqrt{a-2b})$ হলে দেখাও যে $bx^2-ax+b=0$
উঃ এক্ষেত্রে আগের মতো যোগভাগ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করে, পরে বর্গ করে করো।

করণী সম্পর্কিত বিস্তারিত কিছু আলোচনা ও আরও বেশ কিছু অঙ্ক পরে প্রকাশিত হবে।

পরিমিতি সংক্রান্ত কিছু আলোচনা :

মাধ্যমিক সিলেবাসে ঘনবস্তুর আয়তন, তলের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি বিষয়ক কিছু পাঠ্যবস্তু আছে। এই বিভাগের অঙ্কগুলি মূলত সূত্রনির্ভর। তাই সূত্রগুলি সঠিকভাবে জানা দরকার।

- ঘনকের পৃষ্ঠতলের মোট ক্ষেত্রফল $= 6 \times$ (বাহু)^2 বর্গএকক
  ” আয়তন = (বাহু)^3 ঘনএকক
- আয়তঘনকের পৃষ্ঠতলের মোট ক্ষেত্রফল = 2 (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ + দৈর্ঘ্য × উচ্চতা + প্রস্থ × উচ্চতা) বর্গ একক
  ” = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা ঘনএকক।

একটি ঘনকের মধ্যে যে বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের লাঠি রাখা যায় তার দৈর্ঘ্য = বাহু × $\sqrt{3}$ একক।
একটি আয়তঘনকের মধ্যে যে বৃহত্তম দৈর্ঘ্যের লাঠি রাখা যায় তার দৈর্ঘ্য = $\sqrt{\text{দৈর্ঘ্য}^2 + \text{প্রস্থ}^2 + \text{উচ্চতা}^2}$ একক।
মনে করো বৃষ্টির জল আয়তকার ছাদে কোনও নির্দিষ্ট উচ্চতায় জমেছে। পাইপ দিয়ে সেই জল নীচে একটি আয়তঘনকাকার ট্যাঙ্কে জমা হবে। জলের উচ্চতা ওই ট্যাঙ্কে কত হবে? বা নীচে ট্যাঙ্কের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং জমা জলের উচ্চতা দেওয়া আছে। ছাদে বৃষ্টিজল কোন উচ্চতায় জমেছে ইত্যাদি জানতে চাওয়া হতে পারে। সুতরাং সমস্যাটি সূত্রনির্ভর।

- নিরেট লম্ব বৃত্তাকার চোঙের ব্যাসার্ধ = r একক, উচ্চতা = h একক

ওই চোঙের বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r h$ বর্গএকক
ওই চোঙের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r(r+h)$ বর্গএকক
ওই চোঙের আয়তন $= \pi r^2 h$ ঘনএকক
π এর মান দেওয়া না থাকলে সাধারণতঃ $\pi = {}^{22}/_7$ ধরা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে $\pi = 3.14$ দেওয়া থাকতে পারে - সেক্ষেত্রে তাই ধরতে হবে।

- গোলকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= 4\pi r^2$ বর্গএকক (ব্যাসার্ধ = r)
  ” ঘনফল $= {}^4/_3\, \pi\, 4^3$ ঘনএকক
  ” উচ্চতা = 2 r একক
- অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= 2\pi r^2 + r^2 = 3\pi 4^2$ বর্গএকক
  ” ঘনফল $= {}^2/_3\, \pi r^3$ ঘনএকক
- লম্ববৃত্তাকার শঙ্কুর বক্রতলের ক্ষেত্রফল $= \pi rl$ বর্গএকক
  ” ” সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল $= \pi r(r+l)$ বর্গএকক
  ” ” আয়তন ক্ষেত্রফল $= {}^1/_3\, \pi r^2 h$

  { ভূমির ব্যাসার্ধ = r একক
  উচ্চতা = h একক
  তির্যক উচ্চতা = l একক

প্রঃ 48 মিঃ লম্বা, 31.5 মিঃ চওড়া একখণ্ড নিচু জমিকে 6.5 ডেসিমিটার উচুঁ করার জন্য পাশের জমিতে 27 মিঃ লম্বা 18.2 মিঃ চওড়া একটি ডোবা কাটা হল। ডোবার গভীরতা কত? (91, 95)
উঃ ডোবার গভীরতা = h মি হলে
$27 \times 18.2 \times h = 48 \times 31.5 \times .65$ ইত্যাদি

প্রঃ 4 মিঃ ব্যাসের 56 মিঃ লম্বা একটি লম্ববৃত্তাকার টানেল কাটতে গিয়ে যে পরিমাণ মাটি পাথর পাওয়া গেল তা দিয়ে 48 মিঃ দির্ঘ, 16.5 মিঃ প্রশস্ত এবং 4 মিঃ গভীর একটি খাদের কত অংশ ভরাট করা যাবে? (91)
উঃ টানেলের আয়তন $= \pi . 2^2 .56$ বর্গ মিঃ
খাদের যে অংশ পূর্ণ হবে $= ({}^{22}/_7) \times 4 \times 56 \div (48 \times 16.5 \times 4) = {}^2/_9$ অংশ

(লেখক নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের অঙ্কের শিক্ষক)

ওলিম্পিক নিয়ে ডাকটিকিট

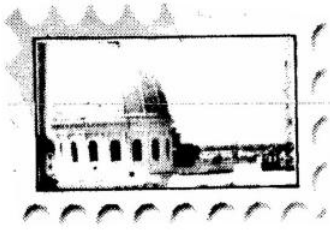

শুরু হয়েছে সিডনি ওলিম্পিক। ওলিম্পিক বিষয়ে প্রকাশিত ডাকটিকিটের কুইজ সঙ্কলন করেছেন অশোক সেনগুপ্ত

(১) ১৯৮৪-র ওলিম্পিক উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪০ সেন্ট দামের একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তাতে কিসের ছবি ছিল?

(২) ১৯৭২ সালে পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ ওলিম্পিক উপলক্ষে একগুচ্ছ ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তাতে তিন প্রতিযোগীসহ একটি রেসিংকারের ছবি ছিল। কোন দেশ এটি?

(৩) ১৯৯২-র বার্সেলোনা ওলিম্পিক উপলক্ষে আফ্রিকার কোন দেশ চার দৌড়বীরের ছবিসহ একটি স্ট্যাম্প প্রকাশ করে?

(৪) মেক্সিকোর ফুটবলআসর উপলক্ষে ১৯৮৬ সালে নাইজেরিয়া একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এটির বিশেষত্ব কী?

(৫) ১৯৮০-র মস্কো ওলিম্পিক উপলক্ষে কোন দেশ সাইক্লিংয়ের ওপর প্রতীকী ডাকটিকিট প্রকাশ করে?

(৬) ১৯৮০ সালে ভারোত্তোলনের ওপর আয়তাকার ডাকটিকিট প্রকাশ করে কোন দেশ?

(৭) ১৯৮০ সালে ওই দেশ বর্গাকৃতি অন্য একটি ডাকটিকিটও প্রকাশ করে? তাতে কিসের ছবি ছিল?

(৮) বর্গাকৃতি ওই ডাকটিকিটে লেখা ছিল তিনটি দেশের নাম। কোন তিন দেশ?

(৯) ১৯৯৩ সালে জাকর্তার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা উপলক্ষে এক সাঁতারুর ছবিসহ ডাকটিকিট কোন দেশ প্রকাশ করে?

(১০) ১৯৭৯-র ১৪ এপ্রিল থেকে মস্কোয় দু'সপ্তাহের জন্য বসেছিল আইস হকির বিশ্ব-প্রতিযোগিতা। এই উপলক্ষে ওলিম্পিকের দু'টি প্রতীকচিহ্নসহ ডাকটিকিট প্রকাশ করে কোন দেশ?

(১১) '৬৮-র মেক্সিকো ওলিম্পিক উপলক্ষে প্রাচীন ঐতিহ্যের দু'টি স্মারকসহ এক দৌড়বীরের ওপর ডাকটিকিট প্রকাশ করে কোন দেশ?

(১২) '৯৬-র আটলান্টা ওলিম্পিক উপলক্ষে দুই দৌড়বীরের চার রঙের একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। কোন দেশ প্রকাশ করে এটি?

(১৩) ১৯৬৮ সালের ওলিম্পিক উপলক্ষে পূর্ব ইউরোপের একটি দেশ দুই কুস্তিগিরের একটি ডাকটিকিটসহ একটি সেট প্রকাশ করে। কোন দেশ?

(১৪) কানাডার মন্ট্রিয়লে ২১-তম ওলিম্পিক উপলক্ষে ওমান একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তাতে কিসের ছবি ছিল?

উত্তর: (১) জলে প্রতিযোগী সাঁতারু। (২) রোমানিয়া। (৩) নাইজিরিয়া। (৪) ওই ডাকটিকিটের মাঝে অন্য একটি ডাকটিকিটের ছবি। সেটি '৯০-এর মেক্সিকো ওলিম্পিকের ফুটবল খেলা উপলক্ষে। (৫) যুগোশ্লাভিয়া। (৬) মঙ্গোলিয়া। (৭) জুডো। (৮) সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স এবং পূর্ব জার্মানি (জি ডি আর)। (৯) ইন্দোনেশিয়া। (১০) মঙ্গোলিয়া। (১১) রাওয়ানডাইস প্রজাতন্ত্র। (১২) আইভরি কোস্ট। (১৩) হাঙ্গারি। (১৪) বরফে একটি লাল রেসিং কার। তাতে হেলমেট মাথায় চার প্রতিযোগী। (১৫) ওমানের গাড়ির সামনে বনেটে দু'টি যোগচিহ্ন, সেই চিহ্ন ভুটানের স্ট্যাম্পের গাড়িতে নেই। (১৬) দু'টি স্কেটিংয়ের ওপর, জিমনাস্টিক ও হকির ওপর একটি করে। (১৭) হাঙ্গারি। (১৮) দু'টি সাঁতার, একটি অসিযুদ্ধ এবং একটি লন টেনিস। (১৯) তাঞ্জানিয়া। (২০) নেটবল, ফুটবল, বোলিং, টেনিস এবং সেলবোর্ডিং। (২১) গ্রিস। (২২) গায়ানা প্রজাতন্ত্র।

(১৫) ১৯৭৬ সালে ইন্সব্রুকের ওলিম্পিক উপলক্ষে ভুটানের প্রকাশ করা একটি ডাকটিকিটে প্রায় একই ছবি। কিন্তু এটির গাড়ি এবং ওমানের স্ট্যাম্পে প্রকাশিত গাড়ির একটি পার্থক্য চোখে পড়ে। সেটি কী?

(১৬) ১৯৭৬-এর ওলিম্পিক উপলক্ষে ভুটান আরও চারটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। বিষয়গুলি কী?

(১৭) ১৯৬৫ সালে একটি দেশ ওলিম্পিক-বলয়ের পরিবর্তে পাঁচটি তারাসহ চাররকম খেলা নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। কোন দেশ?

(১৮) এই চাররকম খেলা কী কী?

(১৯) গোলরক্ষকের নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তসহ ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে আফ্রিকার কোন দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করে?

(২০) কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়া পাঁচটি ছোট ডাকটিকিটের একটি সেট প্রকাশ করে। বিষয় খেলা। কোন কোন খেলার ছবি ছিল তাতে?

(২১) ১৯৯৪ সালে একটি দেশ ফুটবলের ওপর একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। এর অর্ধেকটায় ফুটবল খেলোয়াড়ের ছবি। বাকি অর্ধেকে প্রস্তরশিল্পে ফুটবলার। কোন দেশ?

(২২) ১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে জুলে রিমে কাপের ছবিসহ একটি দেশ দু'টি ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালেও তারা এক ফুটবলারের ছবি-সহ ডাকটিকিট প্রকাশ করে। কোন দেশ এটি?

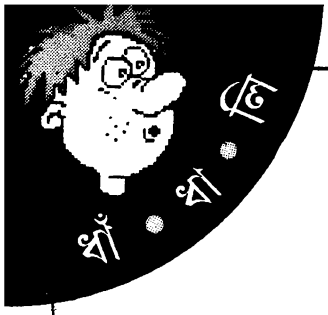

নয় নিয়ে সমস্যা

আমাদের অঙ্কের মাস্টারমশাই যোগেনবাবু সেদিন ক্লাসে ঢুকেই জিজ্ঞেস করলেন, "কোনও গাণিতিক চিহ্নের ব্যবহার না করে কেবলমাত্র তিনটি নয় দিয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যা কী হতে পারে বলো তো।"

উত্তরটা বোধহয় জানা ছিল সিদ্ধার্থ জানার। চটপট দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দিল, "নয়ের ঘাত নয়, তার ঘাত নয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে বললে, নাইন টু দ্য পাওয়ার নাইন টু দ্য পাওয়ার নাইন।"

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন যোগেনবাবু। "ঠিক বলেছ।"

তারপর তিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন। "আসলে, $৯^{৯^{৯}}$ সংখ্যাটা এত বড় যে, এর মান লিখে প্রকাশ করতে প্রায় ১২ বছর সময় লেগে যাবে, অবশ্য নাওয়া খাওয়া সবকিছু বাদ দিয়ে একনাগাড়ে যদি প্রতি সেকেন্ডে একটি করে অঙ্ক লিখতে থাকা যায়। আর এর উত্তরটা বের করতে কতবার গুণ করতে হবে জানো? আটত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষেরও বেশি।"

যোগেনবাবুর কথা শুনে ছাত্রদের চোখ কপালে ওঠার উপক্রম!

গোবর্ধন বলেই ফেলে, "কী ভয়ানক কাণ্ড! বাপ রে।"

যোগেনবাবু বললেন, "ব্যাপারটা আর একটু বুঝিয়ে বলি। $৯^{৯}$ মানে নয়কে ৯ বার লিখে গুণ। অর্থাৎ $৯×৯×৯×৯×৯×৯×৯×৯×৯ = ৩৮৭৪২০৪৮৯$ তা হলে, $৯^{৯^{৯}}$ হল $৯^{৩৮৭৪২০৪৮৯}$। তার মানে, আটত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ কুড়ি হাজার চারশো উননব্বই বার ৯ লিখে গুণ।"

এবারে যোগেনবাবু একটু হেসে বললেন, "তবেই দ্যাখো, নয়ের কেমন গুণ!"

নয় ঘণ্টার খবর

গোবর্ধনের ঘড়িতে এখন সকাল ন'টা। তাই দেখে দিব্যজ্যোতি গোবর্ধনকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা গোবর্ধনদাদা, তুমি কি বলতে পারবে, এখন থেকে ঠিক তেইশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই ঘণ্টা পরে তোমার ঘড়ি অনুযায়ী ক'টা বাজবে?"

গোবর্ধন মনে-মনে সংখ্যাটার চেহারা দেখে নেয়, ২৩৯৯৯৯৯৯৯, কিন্তু এত বড় সংখ্যাটা ভাবতে গিয়ে সবকিছু গুলিয়ে ফেলে।

বিষ্ণুদেব আর সৌম্যদীপ কিন্তু উত্তরটা দিতে পেরেছিল। আশা করি তোমরাও পারবে।

চার সরলরেখায় নয়টি পুজো

দক্ষিণ কলকাতায় সেবার নামী দুর্গাপুজো হয়েছিল ন'খানা। এই ন'খানা পুজো প্যান্ডেলের অবস্থানও ছিল অদ্ভুত সুন্দরভাবে সাজানো, ঘন বর্গাকারে।

সঙ্গে গোল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল।

o o o
o o o
o o o

আমরা সেবার পুজো দেখতে গিয়ে এই ন'খানা প্যান্ডেলের প্রত্যেকটাতে হাজির হয়েছিলাম মাত্র একবার করে। গোবর্ধন বলেছিল, "আমরা কেবল সরলপথেই যাব। কোনওক্রমেই বক্রপথে যাব না।"

আমরা তাই করেছিলাম। আমরা কেবল চারটি সরলপথ আবিষ্কার করেছিলাম ন'খানা পুজো প্যান্ডেলের জন্য। কিন্তু কীভাবে?

৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

যোগ করলে পূর্ণ বর্গ

সংখ্যা তিনটি হল ৪১, ৮০, ৩২০

কারণ,

$৪১+৮০+৩২০=৪৪১=২১^{২}$

$৪১+৮০=১২১=১১^{২}$

$৪১+৩২০=৩৬১=১৯^{২}$

$৮০+৩২০=৪০০=২০^{২}$

তাপমাত্রার ব্যাপারস্যাপার

মাইনাস ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সেন্টিগ্রেড এবং ফারেনহাইট স্কেলে একই হবে। অর্থাৎ —৪০° সেন্টিগ্রেড = —৪০° ফারেনহাইট

কারণ C/৫ = F -৩২/৯ এই সূত্র অনুযায়ী -৪০/৫ = -৪০ -৩২/৯

এর আগে যারা ঠিকমতো ধাঁধালির উত্তর দিয়েছে—

প্রসেনজিৎ ঘোষ (ক্যানাল স্ট্রিট, লেকটাউন, কলকাতা)। **ঐন্দ্রিলা কুণ্ডু** (বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬)। **সৈকত ভৌমিক** (রথখোলা পোস্ট অফিস, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)। **অর্কজ্যোতি পাল** (নিউ আলিপুর, কলকাতা)। **ঋত্বিক মাহাত** (পুরুলিয়া)। **সুদীপ্ত কর্মকার** (চন্দননগর, হুগলি)। **অঞ্জনকুমার পাণ্ডা** (স্কুল বোর্ড অফিস, মেদিনীপুর)। **সায়ন্তন রায়** (আগরপাড়া, পিড়তলা, ২৪ পরগনা)। **চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী** (গৌতমপাড়া, বাগুইআটি, কলকাতা)। **রণিত চক্রবর্তী** (ঝিল রোড, ব্যাঙ্ক প্লট, যাদবপুর)। **পার্থপ্রতিম বসু** (ঝিল পাড়, নববারাকপুর, ২৪ পরগনা)। **অপ্রমেয় পাল** (বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)। **অভিষেক সেনগুপ্ত** (মনোহরচক, কাঁথি, মেদিনীপুর)। **পিয়ালি দাস** (সিউড়ি, বীরভূম)। **পুবালি হালদার** (জি এস বসু রোড, কলকাতা)। **বৈদেহী মুখোপাধ্যায়** (এডিসন রোড, বি-জোন, দুর্গাপুর)। **অর্পণ রায়** (ঠাকুরপুকুর, কলকাতা)। **ভিক্টর কুণ্ডু** (বি-সি ৪৬/৮ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪)।

অমল ভৌমিক

খাদিম-এর ইজবরল

ওলটপালট

নীচে আছে চারটি শব্দ। প্রতিটি শব্দের অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে সাজানো। অক্ষরগুলো ঠিকমতো সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক শব্দটি।

ইরেবসত্য

বাশিথিলস

তত্যনিয়মিনি

দলঠায়াকুর

ধূর্ত তঞ্চকের জাল সই দেখে বিচারকের উক্তি।

এবারে পাশের গোল চিহ্নের ভেতরের অক্ষরগুলো উলটেপালটে সাজালেই পাওয়া যাবে ওপরের কার্টুন ছবির সঙ্কেতের সমাধান।

উত্তর আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

গোয়েন্দা দফতরের চরের ইচ্ছাকৃত ভুল খবর

'সো র সে র মধ্যে ভু ত

গত সংখ্যার সঠিক শব্দ : সেরেস্তাদার, সোনারদেশ, করতলগত, বসনভূষণ।

ঘোষক

গত সংখ্যার সমাধান

না	ই	মা	মা		মি	ঠা	ই		ক
না		ন	র	প	শু		তি	মি	র
সা	ধ	ক		চা	ক		হা		বা
হে		চু	ল			অ	স	ফ	ল
ব	ধ		স্ব		ব	ন্ধ		স	
	ক		মা	সি		কা		ল	তা
জ	ল	পা	ন			র	দ		রা
ড়		লা		বা	স		শ	র	ম
ব	ল	গা		গা	দা	গা	দি		শু
ৎ		ন	বী	ন		ই	ক	বা	ল

১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যার শব্দসন্ধানের প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতা :
সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলমঞ্চপাড়া, খড়দহ।
কুন্তল দাশ, কাঁড়সা, শুঁড়েকালনা, বর্ধমান।
রিমি পাল, ১ নং বাছারপাড়া, কলকাতা-৬৩।

দেবসেনাপতি

শব্দসন্ধান

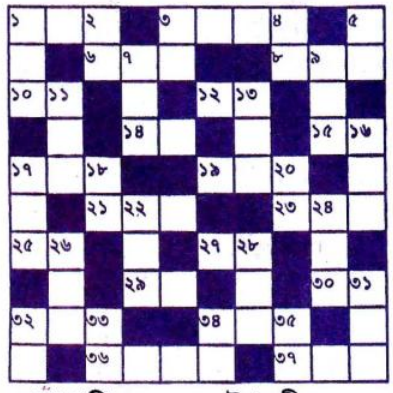

সংকেত : পাশাপাশি :

(১) প্রশংসা, যশ। (৩) হাতের ইশারা, হাতের ইঙ্গিত। (৬) সূর্য, তপন। (৮) গৃহ, ভবন। (১০) মৌমাছি, মাছি। (১২) গৃহ, আবাস। (১৪) এই বিশাল গাছের ছায়া পথিকের ক্লান্তি দূর করে। (১৫) চাবুক। (১৭) বনবাসে গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামচন্দ্রের— হয়েছিল। (১৯) উপার্জন দেখে যা করতে হয়। (২১) এ-দিয়ে তৈরি কাটারি কোনও কাজে লাগে না, ঝকমক করে শুধু। (২৩) বস্ত্র পরিষ্কার করা এর কাজ। (২৫) এরই বুকে জলের ঢেউ লাগে। (২৭) জলপ্লাবন। (২৯) চিংড়ি দিয়ে এর ঘণ্ট অতি উপাদেয়। (৩০) এই শব্দটির উচ্চারণেই জিভে জল আসে। (৩২) খনি, উৎপত্তি স্থান। (৩৪) গ্রাম, মুখগহ্বর। (৩৬) ভদ্র ব্যবহার। (৩৭) বার্ধক্যে যা না-থাকাতে শরীর দুর্বল থাকে।

উপর-নীচ :

(১) সুখে বা সহজে গমনযোগ্য। (২) সমুদ্রের বিশাল জলজন্তু। (৩) প্রতিযোগিতায় যা-হলেও দুঃখ করতে নেই। (৪) এর পাতা, ফল সবই তেতো। (৫) ফলের ভারে যা নুয়ে পড়ে। (৭) টাকার হলে সাবধান। (৯) নানারকম। (১১) শীর্ণতা, দুর্বলতা। (১৩) দেবতা যেখানে থাকেন। (১৬) জলের শাপলা ফুল। (১৭) এক-সঙ্গে আসা, সমবেত। (১৮) চিঠি, পত্র। (২০) গুপ্তদূত, গোয়েন্দা। (২২) '—বাঁয়া কোলেতে টেনে বাদ্যে ভরপুর।' (২৪) গাঢ়, জমেছে এমন। (২৬) হুঁশ, খেয়াল। (২৮) বাদশা—এঁরা সব এখন ইতিহাসের পাতায়। (৩১) যা লিখতে কল্পনাশক্তি লাগে। (৩২) মধুর ফলের মধ্যে অদ্বিতীয়। (৩৩) দড়ি, রজ্জু। (৩৪) হাত, খাজনা। (৩৫) একশো হাজার, নজর।

দেবসেনাপতি

পুরস্কার

এই শব্দসন্ধানের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে যে তিনজনের উত্তর 'আনন্দমেলা' পত্রিকা দফতরে প্রথম এসে পৌঁছবে, তাদের খাদিমের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে পুরস্কার। উত্তরদাতাদের সম্পূর্ণ ঠিকানা ও যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর থাকলে ভাল হয়। উত্তর পাঠাতে হবে **২৭ সেপ্টেম্বরের** মধ্যে।

জেরক্স প্রতিলিপি গ্রাহ্য হবে না

Model : 138007/8/9
Size : 2 - 5/ 12 - 1/9 - 11
Price : Rs. 185.00/ 163.00/150.00

Model : 210003/004
Size : 1 - 8/9 - 13
Price : Rs. 93.00/83.00

Model : 232201/2/9
Size : 7 - 10/ 11 - 13/1 - 5
Price : Rs. 60.00/ 75.00/90.00

Model : 269000/1/2/3
Size : 5 - 8/9 - 2/ 3 - 5/6 - 9
Price : Rs. 55.00/65.00/ 78.00/85.00

Khadim's Schooldays
SMARTNESS... পায়ে পায়ে

MRP (inclusive of all taxes) applicable in West Bengal only.

R K SWAMY/BBDO KSPL 406 2K

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

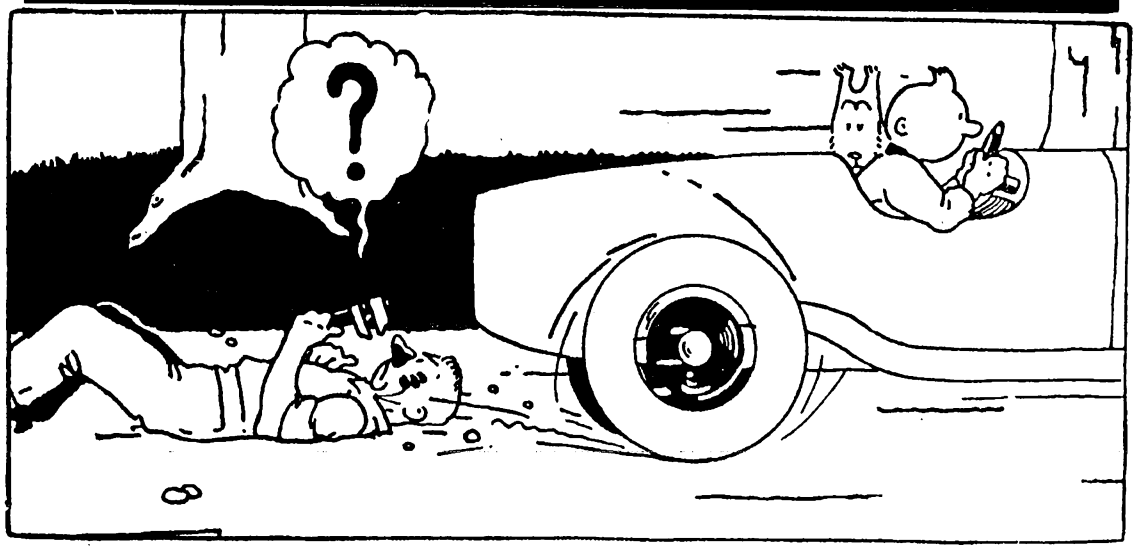

টিনটিন ★ হার্জে সোভিয়েত দেশে টিনটিন

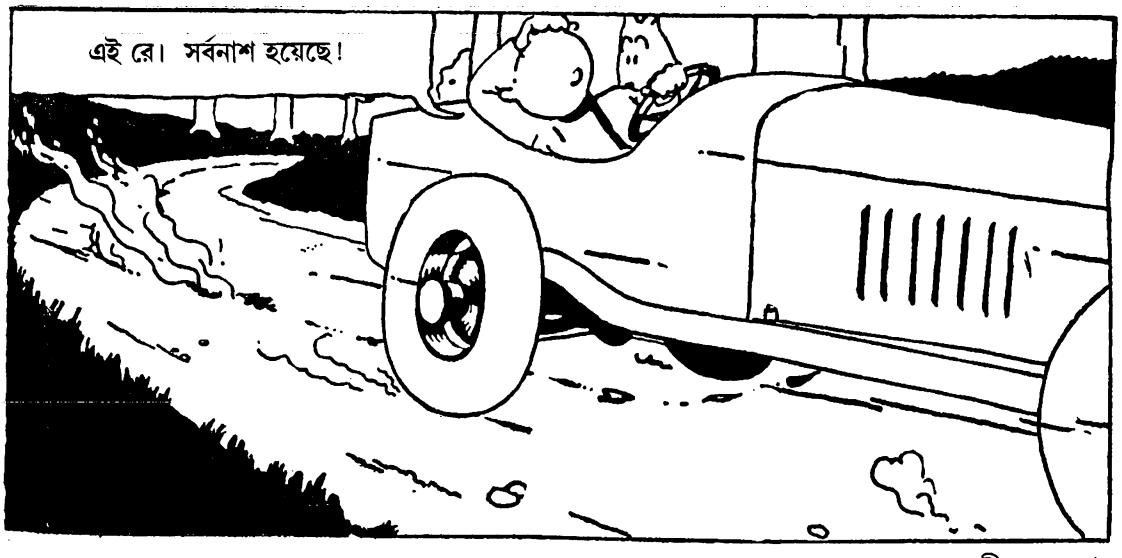

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

অরণ্যদেব

প্রচণ্ড স্রোতে দড়ি খুলে ডেভিল প্রায় ভেসে যাচ্ছিল ...
উঃ!

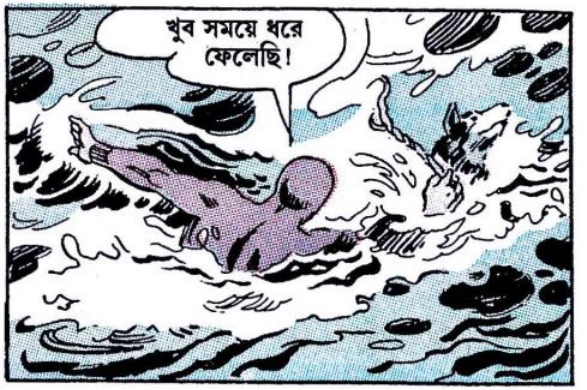
খুব সময়ে ধরে ফেলেছি!

উঃ! আমি তো ভাবলাম গেলেন বুঝি এইবার। অরণ্যদেব বলেই পারলেন।
7-5

সমুদ্রতীরের এদিকের জমিটা দিব্যি সমতল। কারণটা কী?

জেনে যাব একটু পরে। কিন্তু ঢেউয়ের শব্দে ও আমার কথা শুনতে পাবে না।

সমতলভূমি শেষ। এবার আবার খাড়াই বেয়ে উঠতে হবে।

এ-পর্যন্ত তো আসা গেল। এবার অজানা খাড়াই অঞ্চল।

এর পর : অজানা খাড়াই অঞ্চলে।

রোমান সৈনিক অ্যাসটেরিক্স

গল্প : গোসিনি
ছবি : ইউদেরজো

কপিরাইট : দারগো এডিটর্স

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

১. জন সিমসন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোপনে পরমাণু বোমা তৈরির যে গবেষণা চলেছিল ম্যানহাটান প্রকল্পে, এনরিকো ফার্মির সেই দলে তিনি যোগ দেন।
২. রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয়। এদের পিতার নাম অ্যারিয়, অর্থ আর্য। ইনি মনে করেন শিশুর জন্মের দু'দিন পর থেকেই শিক্ষাদান শুরু করা যায় এবং এভাবে শিক্ষিত হলে ১৬ বছর বয়সেই বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ নেওয়া সম্ভব।
৩. 'দাদুয়া ডাকু'। উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ সংলগ্ন রানিপুর সংরক্ষিত অরণ্যে দু'দশক ধরে দাপিয়ে বেড়ায় এই ডাকাত। কিন্তু চোরাশিকারিদের সে যম। ধরলেই নির্মম শাস্তি। এমনকী চোরাশিকারিদের মদতদাতা অসৎ বনকর্মীদেরও রেহাই দেয় না সে। জানিয়েছেন উত্তর-প্রদেশের অরণ্য (বন্যপ্রাণী) সংরক্ষণ বিভাগের অধিকর্তা রামলক্ষণ সিংহ। এমন এক অসৎ বনকর্মীকে প্রথমে প্রহার করে তারপর তাকে বরখাস্ত করার আর্জি জানিয়ে দাদুয়া চিঠি দিয়েছে সরকারকে।
৪. ইতালির পালেরমো শহরে।
৫. হরিয়ানার শোনপথে। এই লোক-আদালতে বিচারকের আসনে ছিলেন জেলা ও দায়রা বিচারক এস কে সারদানা।
৬. কাকদ্বীপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক আশুতোষ শিট। ৮২ বছর বয়স্ক এই শিক্ষানুরাগী মানুষটিকে সম্প্রতি 'দ্য টেলিগ্রাফ স্কুল অ্যাওয়ার্ডস ফর এক্সেলেন্স পুরস্কারে সম্মানিত করা হল।
৭. অমিতাভ ঘোষ।

৮. সরস্বতী দে। সময় করেছেন ১০.৪ সেকেন্ড। জাকর্তায়।
৯. একশো মিটার স্প্রিন্ট ইভেন্টে অনিল কুমার রুপো জিতলেন। সময় ১০.৩৫ সেকেন্ড।
১০. জগদীশ বিশনয়। ছুড়েছেন ৭৬.৮১ মিটার।
১১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ নেউক। আয়তন ২১ বর্গ কিঃ মিঃ। জনসংখ্যা ৮১০০।
১২. ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের দুই ভগিনী এমিলি ইডেন ও ফ্যানি ইডেনের উদ্যোগে।

কুইজ

প্রশ্ন

১. সেপ্টেম্বরের গোড়ায় চমকে দিলেন বলদৃপ্তা এই তরুণী। ভোপাল বিমানবন্দরে শুধু দাঁতের জোরে বিমান টেনে শক্তির পরীক্ষা দিলেন। দু'মাসের মধ্যে এটি দ্বিতীয়বার। গিনেস বুকে নাম তুলতে চাওয়া কে এই তরুণী?
মণীশ ষড়ঙ্গী, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

২. দুই দশক আগে 'আপ জ্যায়সা কোই মেরি জিন্দেগিমে আয়ে'— এই একটি গানই উপমহাদেশে জনপ্রিয়তার শিখরে তুলে দিয়েছিল তাঁকে। এর পর 'ডিসকো দিওয়ানে' রেকর্ডও। ক্যান্সারে ভুগে গত অগস্টে অকালে চলে গেলেন প্রতিভাময়ী এই গায়িকা। কে ইনি?
দীপান্বিতা চৌধুরী, বোড়াল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৩. ফরাসি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনটি কবে? এই তারিখটি বাছা হয়েছিল কেন?
পরেশ সরকার, মাচানতলা, বাঁকুড়া।

৪. দুই কন্যা, ১৫টি নাতি-নাতনি এবং ৩০টির বেশি পো-নাতি-নাতনি এই ৯০ বছর বয়সী মহিলার। কানাডায় কামলুপস বয়স্কদের সদ্য সমাপ্ত আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতায় ১ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে ২০০ মিটার এবং ২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার অতিক্রম করে যথাক্রমে রুপো ও সোনা জিতেছেন। 'মাস্টার এজ রেকর্ডস' বইয়ে নাম ওঠা এই মহিলা আগামী বছর সিডনিতে বয়স্কদের ওলিম্পিকে ১৫০০ মিটার দৌড়ে পদক জেতার আশা রাখেন। কাজ ও দৌড়ই তাঁর জীবনের আনন্দের উৎস। কে এই আশ্চর্য নারী?
অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হুগলি।

৫. সেপ্টেম্বরের গোড়ায় ঘোষিত

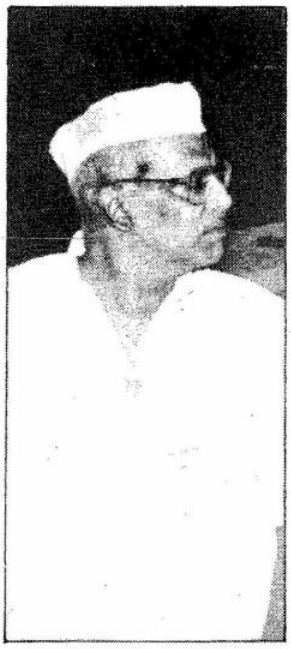

হল ১৯৯৯ সালের 'দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার'। এই পুরস্কার এবার পেলেন জনপ্রিয় হিন্দি চলচ্চিত্রের পরিচালক এক বাঙালি। কে ইনি? তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি কী, যা সার্টিফিকেট অব মেরিট পেয়েছিল?
শ্রীনন্দা দাশগুপ্ত, পাইকপাড়া, কলকাতা।

৬. বিশ্বের দীর্ঘতম সুড়ঙ্গ কোনটি? দৈর্ঘ্য কত? কবে চালু হয়? এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল কত?
সত্যসাধন পাল, কুলটি, বর্ধমান।

৭. গত পাঁচ দশকে বেশ কয়েকবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে এই ছোট্ট দ্বীপের আগ্নেয়গিরিতে। সাময়িকভাবে চলে গেলেও আবার ফিরে এসেছেন দ্বীপবাসীরা। কিন্তু সম্প্রতি আবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটায় সে দেশের সরকার ওই দ্বীপের অধিবাসীদের চিরতরে ওই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বলেছেন। কোথায় এই কাণ্ড?
অভিজিৎ তরফদার, নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

৮. কবজি থেকে দুটি হাত নেই। ফলে ধরতে পারেন না আইস অ্যাক্স, পারেন না রোপ ফিক্স করতে, এমনকী স্নো বুটের ফিতে বাঁধতেও। বিকল্প হিসেবে কাজে লাগান দাঁতকে। তুষারক্ষতে আঙুল হারানো এই মানুষটিই চলেছেন মাউন্ট এভারেস্ট জয় করতে। কে এই দৃঢ়চেতা অভিযাত্রী, যিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেন অসীম মনের জোরে?
নয়না চট্টোপাধ্যায়, টালিগঞ্জ, কলকাতা।

৯. কোন প্রতিবন্ধী পর্বতারোহী প্রথম এভারেস্ট শীর্ষে আরোহণ করেন?
বিমল সেনগুপ্ত, রেডিও গলি, দমদম, কলকাতা।

১০. দুর্ধর্ষ হত্যাকারী। খালি হাতে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে হত্যা করেছেন ২৩টি প্রাণ। আর এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য হত্যাকারী পেলেন সোনার মেডেল। মেডেলটি আবার যাদের হত্যা করা হয়েছে তাদের চেহারার আদলেই তৈরি। হত্যাকারীকে পুরস্কার। ব্যাপারটা কী?
শান্তনু পুরকায়স্থ, নাকতলা, কলকাতা।

১১. সবচেয়ে কম বয়সে সাঁতরে ইংলিশ চ্যানেল পেরনোর রেকর্ড কার?
তমাল অধিকারী, মেমারি, বর্ধমান।

১২. সাক্ষরতা দিবস কবে? কোন সাল থেকে এটি আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
পিয়ালি ধর, সিউড়ি, বীরভূম।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

কুইজ

এবারের বিষয় : সেপ্টেম্বর মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা

প্রশ্ন

১. বিশিষ্ট বাঙালি কথাশিল্পী। তাঁর উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের খ্যাতি অর্জন করেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর শেষ উপন্যাসটি ট্রিলজি করার পরিকল্পনা ছিল পরিচালকের। কিন্তু মৃত্যুর কারণে তা সম্ভবপর হয়নি। তাঁর জীবনাবসান ঘটে এই সেপ্টেম্বর মাসেই। জন্মও এই মাসেই। কে ইনি? তাঁর কোন উপন্যাস রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে?

২. স্বাধীন ভারতে সারা দেশের জন্য একই সময় অর্থাৎ 'ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম' কবে চালু হয়?

৩. ঝকঝকে ইস্পাতের মতো তাঁর শাণিত গদ্য। হিরের মতো ধার তাঁর চলিত ভাষায়। গোলাপের সঙ্গে জোলাপের জল দিয়ে সনেটও লিখেছেন। 'সবুজপত্র' তাঁর চিন্তার ধারক। তাঁর গদ্য 'বীরবলী গদ্য' নামেই কথিত। রবীন্দ্রনাথের আদরের ভাইঝির স্বামী। প্রয়াত হন সেপ্টেম্বরেই। কে ইনি?

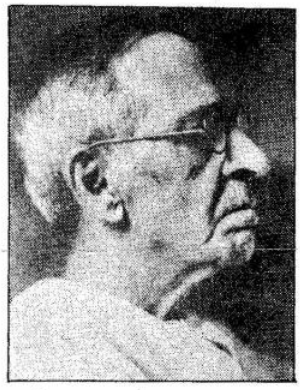

৪. সে আমলে বিশিষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাবিদ হিসেবে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও খ্যাতি ছিল তাঁর। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। কে এই বাঙালি দার্শনিক, সেপ্টেম্বরেই যাঁর জন্ম?

৫. কলকাতা থেকে অনেক দূরে পুরুলিয়ায় জন্ম এই বিশিষ্ট রসায়নবিদের। এই সেপ্টেম্বরেই। কবে? কে ইনি?

৬. তাঁর 'ভারতবর্ষ' পড়েনি এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিখ্যাত হয়ে আছে 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে' পংক্তি। কে ইনি, যাঁর জন্ম এই সেপ্টেম্বরেই?

৭. বিশিষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিক। ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েও জ্ঞানচর্চায় ভাটা পড়েনি। সারা পৃথিবীর চোখে শ্রদ্ধেয় এই বিশিষ্ট নেতার জন্মদিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালিত হয় গোটা দেশ জুড়ে। কবে থেকে? কে ইনি?

৮. বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম ইনি। 'রেজারেকশান', 'অ্যানা ক্যারেনিনা', 'ওয়ার অ্যান্ড পিস'-এর মতো উপন্যাস ও 'হাউ মাচ ল্যান্ড এ ম্যান রিকোয়্যার্স'-এর মতো গল্পের জন্ম এই মানুষটির হাতেই। কে ইনি, যাঁর জন্ম সেপ্টেম্বরেই?

৯. ঠাকুরবাড়ির এই মেয়ে এক সময় ছিলেন খাপখোলা তলোয়ারের মতো তেজস্বিনী। পরাধীন ভারতে অনেকের মনেই স্বাধীনতার বীজমন্ত্র ছড়িয়েছিলেন তিনি। 'জীবনের ঝরাপাতা' তাঁর বিখ্যাত রচনা। কে ইনি, যাঁর জন্ম এই সেপ্টেম্বর মাসেই?

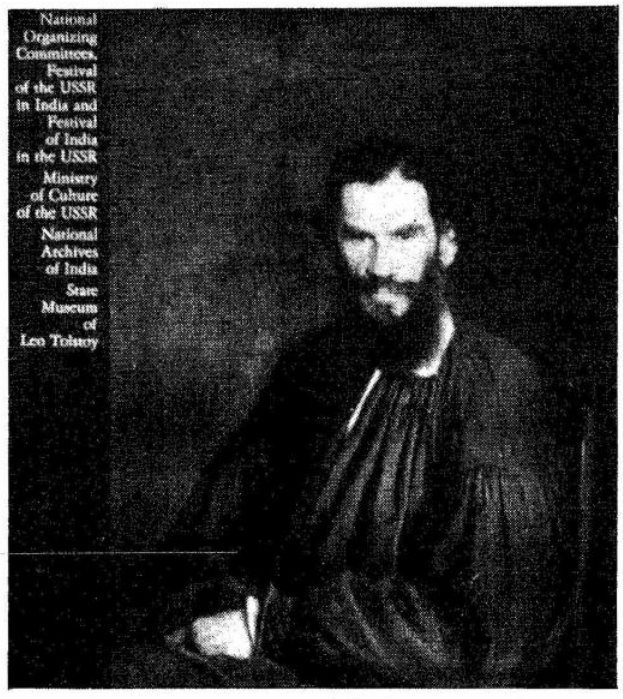

১০. বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক। প্রস্তর যুগের আবিষ্কর্তা এঁকেই বলা হয়। জন্ম সেপ্টেম্বরেই। কে ইনি?

১১. বিশ্বে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্কের ব্যবহার সেই প্রথম। এই সেপ্টেম্বরেই। কবে?

১২. বিখ্যাত তাঁর 'চাচা কাহিনী', 'পঞ্চতন্ত্র', 'দেশে-দেশে'। পাণ্ডিত্য ও সরসতার এমন মেলবন্ধন খুব কম সাহিত্যিকের রচনাতেই পাওয়া যায়। সেপ্টেম্বরেই জন্ম, কে এই সাহিত্যিক?

১৩. জন্মসূত্রে কলকাতার না হলেও তাঁর কর্ম ও সেবাযজ্ঞ ছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করেই। সারা বিশ্বের চোখে শ্রদ্ধেয় কে এই মহীয়সী, যাঁর প্রয়াণ সেপ্টেম্বরেই?

উত্তর

১. 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক'-এর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর। মৃত্যু ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর। তাঁর মৃত্যুর পর 'ইছামতী' উপন্যাস রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ২. ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে। ৩. বীরবল ছদ্মনামধারী বিশিষ্ট লেখক প্রমথ চৌধুরী। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর স্বামী। প্রয়াত হন ১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর। ৪. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। জন্ম ১৯৬৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। ৫. রসায়নবিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ। ১৮৯৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জন্ম তাঁর। ৬. এস ওয়াজেদ আলি। জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯০। ৭. সর্বপল্লী ডঃ রাধাকৃষ্ণন। জন্ম ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। ১৯৬২ সাল থেকে এ-দিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ৮. লিও নিকোলায়োভিচ টলস্টয়। রাশিয়ার টুলু প্রদেশে এঁর জন্ম ১৮২৮ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। ৯. সরলা দেবীচৌধুরানী। ১০. ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক বুশার দ্য পার্থস। ১১. ১৯১৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন প্রথম যুদ্ধে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। ১২. সৈয়দ মুজতবা আলি। ১৯০৪ সালে শ্রীহট্টের করিমগঞ্জে তাঁর জন্ম। ১৩. নোবেলজয়ী মাদার টেরেসা। প্রয়াণ ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর।

সেই বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চিনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারি বই হিসাবে দাম্মি না হলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে।

তার একটা গল্প দেখে আমার প্রথমে খটকা লাগে। ওই ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-একশো বছর আগে চিনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

তিনি তাঁর লিখিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন– কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকত, আর সর্বক্ষণ চেঁচাত...

সম্রাট কনিষ্ক যারা গেছেন স্বাভাবিকভাবে- তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর একথা কেউ যদি বলে তবে তা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে...

সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইঁদারায় বসে আছে, আমাকে যেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও!

যাই হোক ওই লেখাটার মধ্যে ইতিহাসের কিছু ঘটনা মিলিয়ে যা স্পষ্ট হয়ে উঠল তা হল...

সাতবাহন রাজা কনিষ্কের হাতে নিহত হবার পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। রাজ পরিবার ও মন্ত্রী পরিবারের কয়েকজন পুরুষ প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে...

চদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনও উপায়েই হোক, আমরা কনিষ্ককে খুন্ত হত্যা করব।

এজন্য আমরা জীবন দিতেও প্রস্তুত।

কনিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে সপ্তকবাহিনীর* দু'জন তাঁর মূর্তির মাথা ভেঙে নেয়। তাঁদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানি পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন।

*সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষেরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তকবাহিনী।

বাধ্য হয়ে গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে...

এখানকার গ্রামে যে যাকো সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে- মোটা ওই সপ্তক-বাহিনীর একজন হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

কেউ হয়তো মধ্যরাতে সেই বাহিনীর একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখে ফেলেছিল...

!

কাশ্মিরে এসে তারা আটকে যায়। কাশ্মিরে তখন গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে, আর এটাই ছিল তখন যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা...

মনে হয় তাদের মধ্যে একজন পালা করে রাতে বেরোত খাবার-দাবার ও খবর সংগ্রহ করতে।

...তারপর মুখে মুখে অলৌকিক কাহিনী তৈরি হয়ে গেছে।

ভয়ংকর সুন্দর • কাহিনী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় • চিত্রনাট্য ও ছবি বিমান কর্মকার

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

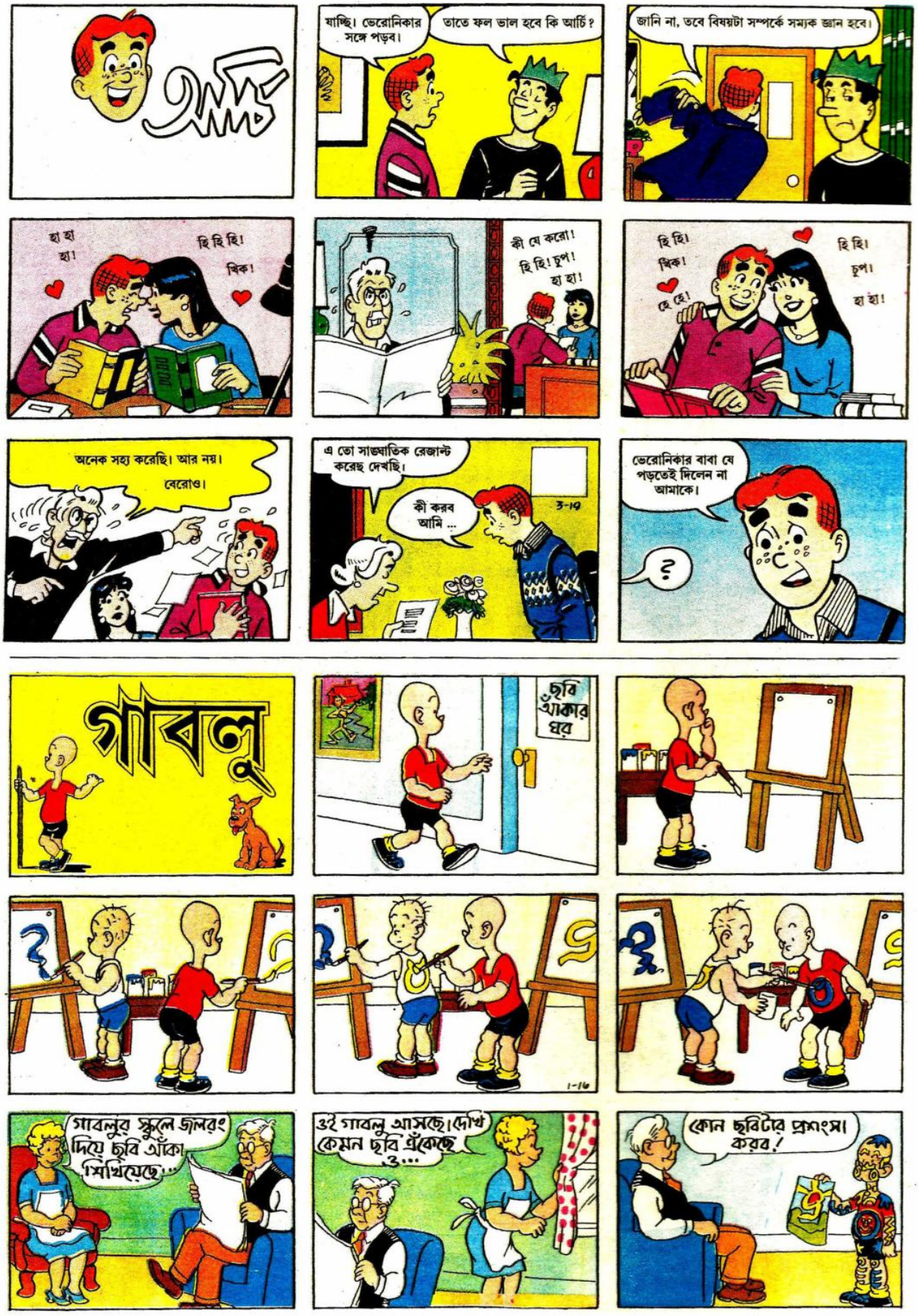
আর্চি
যাচ্ছি। ভেরোনিকার সঙ্গে পড়ব।
তাতে ফল ভাল হবে কি আর্চি?
জানি না, তবে বিষয়টা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হবে।
হা হা হা!
হি হি হি!
খিক!
কী যে করো!
হি হি! চুপ!
হা হা!
হি হি!
খিক!
হে হে!
হি হি!
চুপ।
হা হা!
অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। বেরোও।
এ তো সাঙ্ঘাতিক রেজাল্ট করেছ দেখছি।
কী করব আমি ...
3-17
ভেরোনিকার বাবা যে পড়তেই দিলেন না আমাকে।
?
গাবলু
ছবি আঁকার ঘর
1-16
গাবলুর স্কুলে জলরং দিয়ে ছবি আঁকা শিখিয়েছে...
ওই গাবলু আসছে। দেখি কেমন ছবি এঁকেছে ও...
কোন ছবিটার প্রশংসা করব!

জিন্‌স বনাম পরিবেশ

পুজো এসে গেল, ইতিমধ্যেই পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে পুজোর বাজার। কিন্তু জিন্‌সের বাজার করতে গিয়ে সাবধানে থাকতে হবে। কেননা স্টোনওয়াশ জিন্‌সের খোঁজ মিললে হয় তা হবে পুরনো জিনিস কিংবা নকল। কারণ সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশে স্টোনওয়াশ জিন্‌স রফতানি করা বন্ধ হয়ে গেছে। স্টোনওয়াশ জিন্‌স তৈরি করতে লাগে এক বিশেষ পাথর, যা কেবল আমেরিকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পাওয়া যায়। লক্ষ-লক্ষ স্টোনওয়াশ জিন্‌স তৈরি করতে ওই অঞ্চল থেকে এমনভাবে পাথর তোলা হচ্ছিল যে, পরিবেশবিদরা ও ওখানকার স্থানীয় মানুষ একযোগে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। তাঁদের আশঙ্কা, এমন চলতে থাকলে অবিলম্বে বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় অসম্ভব নয়। এ-নিয়ে অনেক টালবাহানার পরে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এর পর থেকে স্টোনওয়াশ জিন্‌স তৈরি হবে শুধুমাত্র আমেরিকার বাজারে বিক্রির জন্য।

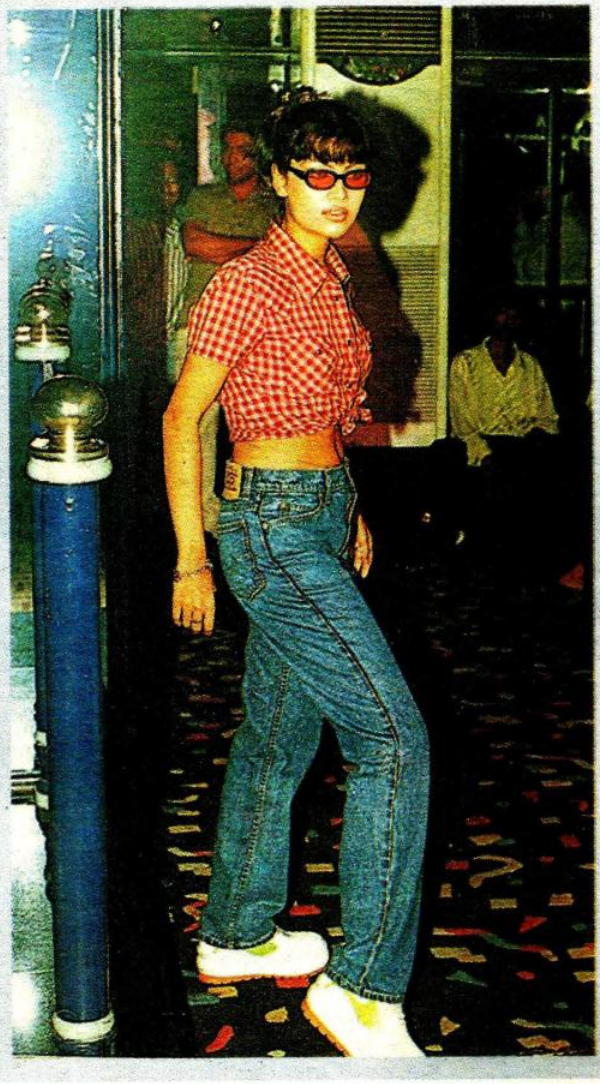

সবুজের অভিযান

পরিবেশ বাঁচাতে এবার আন্দোলনে নামবে কচিকাঁচাদের দল। কলকাতা শহরে পরিবেশ দিবস বা এ-ধরনের দিনগুলিতে বিশেষ বিশেষ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দেওয়াল লিখন মুছে পরিবেশ বাঁচানোর চেষ্টা ইতিমধ্যেই পুরনো খবর হলেও এবার অনেক বড় সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। এতে যেমন থাকবে কলকাতা থেকে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল, তেমনই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের

স্কুলও। সব মিলিয়ে অংশ নেবেন ১৪টি স্কুলের ছেলেমেয়ে ও তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ-নিয়ে সদ্য কর্মশালা হয়ে গেল শাখাওয়াত মেমোরিয়াল হাই স্কুলে।

উপসাগরীয় যুদ্ধের ফল

'গাল্‌ফ ওয়ার সিনড্রোম' কথাটা শোনা যাচ্ছিল বহুদিন ধরেই। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশ নেওয়া সৈনিকদের হচ্ছিল অজানা সব অসুখ। জ্বর, কিডনির সমস্যা ইত্যাদি। সদ্য এ-রহস্য ভেদ করেছেন ডঃ আসফ

ডুরাকেভিক। তাঁর মতে, ওই যুদ্ধের সময় ব্যবহার হওয়া ৩২০ টন ইউরেনিয়ামই হল গাল্‌ফ ওয়ার সিনড্রোমের মূল কারণ। "এই ইউরেনিয়াম কণাগুলি বাতাসের সঙ্গে মেশে এবং স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধে অংশ নেওয়া সৈনিকদের শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে। তাঁদের যাবতীয় লক্ষণই বলছে ইউরেনিয়ামই দায়ী," আসফের পরিষ্কার বক্তব্য।

পরমাণু দূষণ

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর কাছে সদ্য একটি অভিযোগ জমা দিয়েছেন কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মীরা। অভিযোগ জমা দেওয়ার মধ্যে নতুনত্ব নেই, নতুনত্ব রয়েছে অভিযোগের মধ্যে। ওই কর্মীদের কথা অনুযায়ী, বসু বিজ্ঞান মন্দিরে হওয়া বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পারমাণবিক বিকিরণ হয়, সেই দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তাঁরা। চামড়ার সমস্যা থেকে শুরু করে নানা বিকিরণ দূষণজনিত সমস্যা হচ্ছে।

জয়ন্ত বসু

পারবে কি ক্যারাকাল

জনপদ থেকে দূরে প্রাকৃতিক নির্জনতার মধ্যে সামরিক বিমানবন্দর। শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার এ এক চমৎকার কৌশল। কিন্তু কখনও কখনও প্রকৃতিই বাধ সাধে হঠাৎই বিমানের সামনে কিংবা বিমানবন্দরে ঢুকে পড়ে পাখি। পাখি ধরতে আবার ওস্তাদ দ্রুতগামী চকচকে, ছোট ছোট লোমওয়ালা বনবিড়াল 'ক্যারাকাল' (Caracal)। কিন্তু লন্ডনে খাঁচায় বন্দি, বদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত ক্যারাকাল কি সত্যিই এই কাজ করে দেখাতে পারবে? ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে, ১৩ সেপ্টেম্বর, সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় এই নিয়ে ভারী সুন্দর একটি অনুষ্ঠান দেখানো হল।

পেঙ্গুইনদের বাঁচাতে

মানুষ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম ও সুন্দর পেঙ্গুইনের দল আশ্রয় নিয়েছে সিডনি হারবারে। এদের গোপন আস্তানার খবর মাত্র কয়েকজন সিডনিবাসী জানেন। জন্মের সময় পেঙ্গুইনদের নানা প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয়। ছোট্ট সুন্দর পেঙ্গুইনদের বাঁচাতে দু'জন বনরক্ষক এদের আস্তানায় হাজির। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে, ১৫ সেপ্টেম্বর, সন্ধে সাড়ে পাঁচটায় ও রাত ন'টায় অনুষ্ঠানটি দেখা গেল।

নূপুর চৌধুরী

আকাশে টাইটানিক

নিউ ইয়র্কের কাছে ১৯৩৭ সালে হিন্ডেনবার্গ নামের এয়ারশিপ ভয়ঙ্কর আগুনে ধ্বংস হয়ে গেল। এই নিয়ে নানা বাক্‌বিতণ্ডা। পাঁচতারা হোটেলের স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা এই আকাশযান কেন ভেঙে পড়ল? মানুষের ষড়যন্ত্র, না কি যান্ত্রিক ত্রুটি? না কি ক্রুদ্ধ কৃষকরা গুলি ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেন এয়ারশিপের গায়ে? শেষবারের মতো অতলান্তিকের ওপর দিয়ে ওড়ার আগেই দ্রুতগতির যানটি ভেঙে পড়ে। মারা যান ৭২ জনের মধ্যে ৩৫ জন যাত্রী। বেঁচে যায় দুই শিশু—ওয়ার্নার ডনার ও ওয়ার্নার ফ্রান্স। তাদের মুখে শোনা যাবে সেই ভয়াবহ কাহিনী। দেখা যাবে, টাইটানিক অব দ্য এয়ার। সেপ্টেম্বর ২৪, রবিবার, সকাল আটটায়, ডিসকভারি চ্যানেলে।

অ্যাডভেঞ্চার রাত দশটায়

এই সেপ্টেম্বরে ডিসকভারির সঙ্গে যাওয়া যাক দুর্গম কিছু জায়গায় অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে। সঙ্গে যাবেন অদম্য একদল তরুণ ও ফিল কেঘান। কোস্টা রিকার জীবন্ত আগ্নেয়গিরি অথবা বাহামার ক্ষুধার্ত হাঙর। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কোনও অভাবই নেই। প্রতিটি জায়গায়, স্থানীয় অধিবাসী, তাঁদের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার রীতি, সবকিছুর সঙ্গেই ফিল পরিচয় করান। স্কাই-ডাইভিং থেকে শব্দের গতিলঙ্ঘন, কিংবা হাঙরদের নিজের হাতে খাওয়ানো। ফিলের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আছে সব কিছুই। প্রতি শনিবার, রাত দশটায়, অ্যাডভেঞ্চার ক্রেজি, ডিসকভারি চ্যানেলে।

মহুয়া সেনগুপ্ত

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের সৌজন্যে

ওলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিততে চান ক্যাথি

তাঁর দেশের তিন লক্ষ ছিয়াশি হাজার আদিবাসী মানুষের স্বপ্ন সফল করতে ওলিম্পিকে ৪০০ মিটার দৌড়ে নামছেন ক্যাথি ফ্রিম্যান। আটলান্টা ওলিম্পিকে রুপোবিজয়িনী ফ্রিম্যান কি পাবেন সিডনি ওলিম্পিকে সোনার পদক? জানিয়েছেন চন্দন রুদ্র

সিডনি ওলিম্পিক শুরুর অনেক আগে থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে ক্যাথি ফ্রিম্যানের নাম। অস্ট্রেলিয়ার মহিলা অ্যাথলিট। আদিবাসী এই মেয়েটি সিডনি ওলিম্পিকে নামার আগেই হইচই ফেলে দিয়েছেন। ৪০০ মিটার দৌড়ে পর পর দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান, গত আটলান্টা ওলিম্পিকে রুপোজয়ী এই অ্যাথলিটকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন অস্ট্রেলিয়ার মানুষ। সিডনি ওলিম্পিকে অস্ট্রেলিয়ার বঞ্চিত অবহেলিত আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতীক এখন ক্যাথি।

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে ক্যাথির আবির্ভাব ১৯৯০ সালে। আদিবাসী পরিবারের ১৫ বছরের এই মেয়েটি ওই বছরই নিজের যোগ্যতায় কমনওয়েলথ গেম্সে অস্ট্রেলিয়ার ৪×১০০ মিটার রিলে রেস দলে জায়গা করে নেন। অকল্যান্ডের ওই প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা সোনা জয় করেন। প্রচারের আলোয় উঠে আসেন ক্যাথি। এর পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। চার বছর পর ১৯৯৪ সালে কানাডার ভিক্টোরিয়া কমনওয়েলথ গেম্সে প্রথম বড় সাফল্য তুলে নেন তিনি। ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা জয় করেন। ১৯৯৬ সালে আটলান্টা ওলিম্পিকে ফ্রান্সের মেরি জো পেরেসের কাছে হেরে গিয়েছিলেন ক্যাথি। পেয়েছিলেন রুপো। তবে একবছর পরই আথেন্সের বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে ক্যাথি ৪০০ মিটারে সোনা জিতে হইচই ফেলে দেন। ১৯৯৩-তে স্পেনের সেভিলে ক্যাথি দ্বিতীয়বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হন। এই মুহূর্তে তিনিই অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র অ্যাথলিট, যাঁর ঝুলিতে আছে দুটি বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপের খেতাব। ছেলেবেলা থেকেই সেরা অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন ক্যাথি।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই নিজ ভূমে পরবাসী। এ-বিষয়টি নিয়ে গোড়া থেকেই সোচ্চার হয়েছেন ক্যাথি। ১৯৯৪ সালে

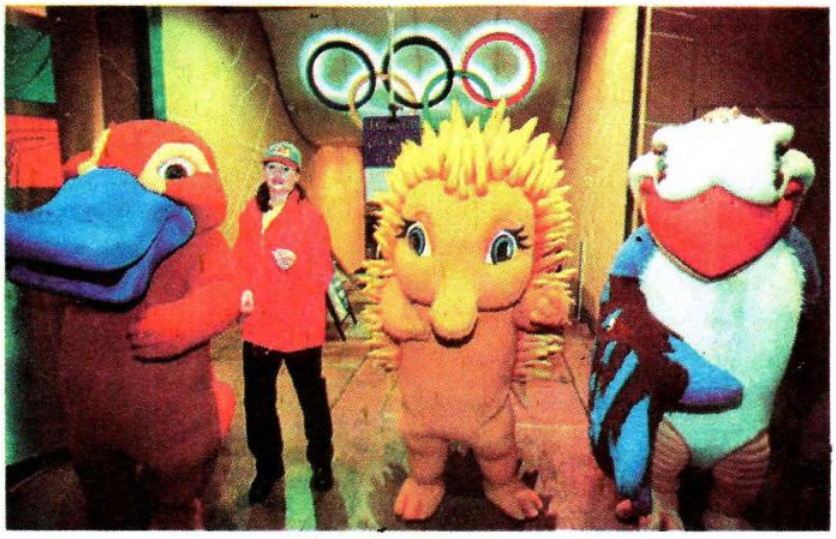

কমনওয়েলথ গেম্সে ৪০০ মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর আনন্দে উদ্বেল ক্যাথি ভিক্ট্রি ল্যাপের সময় অস্ট্রেলিয়ার পতাকার সঙ্গে লাল-হলুদ-কালো রঙের আদিবাসী পতাকা গায়ে জড়িয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। এজন্য দলনেতা আর্থার টানস্টল সকলের সামনে তাঁকে ভর্ৎসনাও করেন। তবু তিনি দমে যাননি। এখন অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৩,৮৬,০০০ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘদিনের বঞ্চনার প্রতিবাদে আদিবাসীরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে নেমেছেন। প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে আদিবাসীরা সিডনি ওলিম্পিককে বেছে নিয়েছেন। কোনওরকম 'বয়কট' কিংবা গেম্স পণ্ড করার অভিপ্রায় তাঁদের নেই। তবে তাঁরা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। সম্পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন ক্যাথিও। ওলিম্পিক চলাকালীন সিডনির প্রতিটি জায়গায় উড়বে আদিবাসীদের পতাকা। শুরুতে উদ্যোক্তারা রাজি না হলেও পরে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির নির্দেশে তা মেনে নেওয়া হয়। লাল-হলুদ-কালো রঙের মাধ্যমে পৃথিবী, সূর্য এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকেই বোঝানো হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রীড়াবিদ্দের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এখন ক্যাথি। দু'বছরের বিশ্বচ্যাম্পিয়ান সিডনিতে তাঁর প্রিয় ইভেন্ট ৪০০ মিটারে ফেভারিট হিসেবেই নামছেন। তাঁর সোনা জেতার পথে প্রধান বাধা হয়ে উঠতে পারেন গত ওলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট ৩২ বছরের মেরি জো পেরেস। ২৫ সেপ্টেম্বর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের আসর। সেদিন ৪০০ মিটার দৌড়ে নামবেন ক্যাথি। জনপ্রিয় এই অ্যাথলিটের দৌড় দেখার জন্য সিডনির টিকিট কাউন্টারের সামনে দীর্ঘ লাইনও দেখা গেছে। সিডনি ভিক্টোরিয়া পার্কে শিবির করে থাকা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষই ওইদিনের অধিকাংশ টিকিট কিনে নিয়েছেন। তাঁরা স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ান ক্যাথিকে আদিবাসী পতাকা নিয়ে দৌড়তে দেখতে চান। ২৭ বছরের ক্যাথিও চান সিডনিতে সোনা জিতে অস্ট্রেলিয়ার মানুষের স্বপ্ন সফল করতে।

ম্যারাথন দৌড়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন আবেবে বিকিলা

ওলিম্পিক যতদিন থাকবে, জ্বলজ্বল করবে আবেবে বিকিলার নাম। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই ম্যারাথনারের আশ্চর্য সাফল্যের কাহিনী লিখেছেন সুজন ঠাকুরতা

অবিশ্বাস্য! ১৮৯৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ওলিম্পিক ম্যারাথনে যা হয়নি, সেই ঘটনা ঘটল ১৯৬০ সালের রোম ওলিম্পিকে। এই প্রথম ম্যারাথনে এক কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান সোনা জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। ৩৫টি দেশের ৬৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রথম হয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন ইথিওপিয়ার ম্যারাথন রানার আবেবে বিকিলা।

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির দেহরক্ষী আবেবে বিকিলা ২৮ বছর বয়সে খালি পায়ে নামেন রোম ওলিম্পিকে, জীবনের তৃতীয় ম্যারাথন দৌড়ে। ইথিওপিয়া ও ইতালির মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ছিল। রোম সম্রাট বেনিটো মুসোলিনি দখল করেছিলেন ইথিওপিয়া। শেষ পর্যন্ত যে পথে ইথিওপিয়া থেকে রোমে পালান ইতালীয়রা, সেই পথ ধরেই দৌড়ন বিকিলা এবং পরাস্ত করেন শ্বেতকায় (ইতালি সহ) প্রতিযোগীদের। শুধু এই নয়, দৌড়নোর সময় যেখানে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রভুর উদ্দেশে প্রার্থনা জানান। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম করার সময় মা মেরি ও যিশুর উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। অন্যান্য দৌড়বীররা ক্রমশ পিছোতে থাকেন। দৌড় শেষ হওয়ার ৬০ গজ আগে আবেবের সামনে উলটে পড়েন এক স্কুটার-আরোহী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিকিলা প্রথম হন মরক্কোর রাহদি বেন আবদে সেলেমকে ২০০ গজ পেছনে ফেলে। ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট, ১৬.২ সেকেণ্ড সময়ে দৌড় শেষ করে ওলিম্পিক রেকর্ড করেন বিকিলা। কিন্তু এত বড় ইতিহাস রচনায় তিনি ছিলেন স্বাভাবিক এবং নির্বিকার।

তবে রোমেই শেষ নয় বিকিলা কাহিনীর। ম্যারাথনের জগতে নতুন নজির স্থাপন করেন তিনি ১৯৬৪ সালের টোকিও ওলিম্পিকে। গতবারের বিজয়ী বিকিলাকে ১৯৬৪ সালের ওলিম্পিকে হিসেবের মধ্যে রাখেননি বিশেষজ্ঞরা। ওলিম্পিকের ৪০ দিন আগে বিকিলার একটি বড় অস্ত্রোপচার হয়। কাজেই ওলিম্পিকে বিকিলার যোগ দেওয়া ছিল অনিশ্চিত। টোকিওতে আবেবে খালি পায়ে নয়, জুতো পরেই দৌড়ন। সম্ভাব্য বিজয়ী ফেভারিট অস্ট্রেলিয়ার রন ক্লার্ক ও আয়ারল্যান্ডের জিম হোগানকে পেছনে ফেলে সোনা জেতেন। জাপানের টোকিও শহরের তোসি তাকু মাচি মোড়ে বিকিলা পেছনে ফেলে দেন রন ক্লার্ককে, তারপর অতিক্রম করেন জিম হোগানকে। ২৫ থেকে ৩৫ কিমি পর্যন্ত গতি বাড়িয়ে সকলের নাগালের বাইরে নিজেকে নিয়ে যান তিনি। স্টেডিয়ামে ঢোকার সময় উপস্থিত ৭০,০০০ দর্শকের সকলে আসন ছেড়ে উঠে অভিনন্দন জানান বিকিলাকে। ২ ঘণ্টা ১২ মিনিট ১১.২ সেকেণ্ডে দৌড় শেষ করে ম্যারাথনের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তিনি, দ্বিতীয়বার ওলিম্পিকে সোনা জিতে। সোনা জেতার পর সাইকেলে চেপে সমগ্র স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করেন বিকিলা এবং সহাস্যে বলেন, "দৌড়টা বড় তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললাম, এখনও আরও ১০ কিমি দৌড়তে পারি।" ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো সিটিতে তৃতীয়বার ওলিম্পিক পদক জয়ের লক্ষ্যে নেমেছিলেন তিনি, কিন্তু ১৭ কিলোমিটারের পর পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে দৌড় থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। শেষ হয়ে যায় ওলিম্পিকে বিকিলা উপাখ্যান। বিখ্যাত দৌড়বীর আবেবে বিকিলা ১৯৬৯ সালে এক মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। ভেঙে যায় বিকিলার কাঁধের হাড় ও মেরুদণ্ড, অসার হয়ে পড়ে নিম্নাঙ্গ। দৌড়কে চিরতরে বিদায় জানাতে বাধ্য হন তিনি। কিন্তু ইথিওপিয়া তাঁকে দেয় বিরল সম্মান। দেশে তাঁর নামে তৈরি হয় 'বিকিলা স্টেডিয়াম'। হুইল চেয়ারে চেপে এসে স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন আবেবে বিকিলা। সেই সময় তাঁর পাশে ছিলেন সম্রাট হাইলে সেলাসি। সম্রাট সহ সমগ্র দেশবাসী সাশ্রুনয়নে অভিনন্দিত করেন তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়কে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যারাথনার আবেবে বিকিলার সাফল্য কল্পনাতীত, চমকপ্রদ, অসাধারণ। ওলিম্পিক যতদিন থাকবে ততদিন ওলিম্পিকের ইতিহাসে জ্বলজ্বল করবে আবেবে বিকিলার নাম।

ওলিম্পিকের খেলাধুলোয় নানা শব্দ

ওলিম্পিকে আছে নানারকম খেলা। সব খেলাতেই আছে বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ। সেরকমই কয়েকটি শব্দ নিয়ে লিখেছেন শান্তনু ঘোষ ও বিশ্বপ্রিয় নন্দী

অ্যাটাক ব্লক (ভলিবল) : বলকে এমনভাবে ব্লক করা যাতে তা বিপরীত কোর্টে সূক্ষ্ম কোণে পড়ে। একেই 'অ্যাটাক ব্লক' বলে।

ইয়োকো (জুডো) : জুডোতে 'ইয়োকো' মানে পাঁচ পয়েন্ট।

ক্যাচ (রোয়িং) : দাঁড়ের ব্লেডটি সম্পূর্ণভাবে জলে ডোবানোকে 'ক্যাচ' বলে, এগোতে হলে রোয়ারকে ক্যাচ করতেই হবে।

কায়ো (বক্সিং) : নক-আউট করার অন্য নাম 'কায়ো'।

নি-ওয়াজা (জুডো) : প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছুড়ে ফেলার পর আবার চেপে ধরার কায়দা।

ট্যাঙ্ক (টেনিস) : ইচ্ছে করে হেরে গেলে 'ট্যাঙ্ক' করেছে বলা হয়। সাধারণত লন টেনিসের ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

পিরুয়েট (জিমনাস্টিক্স) : প্যারালাল বারে হাতের ওপর ভর রেখে পাক খাওয়াকে বলে ডিগবাজি।

কার্ডবয় (সাইক্লিং) : যেসব সাইক্লিস্ট সাইক্লিংয়ের অলিখিত সৌজন্যের নিয়মগুলি মেনে চলেন না তাঁদের বলা হয় 'কার্ডবয়'।

লুম (রোয়িং) : দাঁড়ের হ্যান্ডেল ও ব্লেডের মধ্যবর্তী অংশকে 'লুম' বলা হয়।

ব্যাক ওয়াটার (ক্যানোয়িং) : অনেক সময় বৈঠাকে সামনের দিকে ঠেলে ক্যানোকে পেছনের দিকে আনা হয়। বৈঠকে এই সামনের দিকে ঠেলার নাম 'ব্যাকওয়াটার'।

'এল' সাপোর্ট (জিমনাস্টিক্স) : এটি জিমনাস্টিক্স-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

হাতের ওপর ভর রেখে শরীরকে শূন্যে ভাসমান রাখা। পা দুটি সামনের দিকে আনুভূমিকভাবে থাকে।

ক্রিপ (তীরন্দাজি) : ধনুক থেকে নির্গত হওয়ার আগে পর্যন্ত তীরের চলন বা গতি।

ম্যান্ডেটরি কাউন্ট (বক্সিং) : কোনও বক্সার ঘুসি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে রেফারি আট অবধি গোনেন। তার পর আবার খেলা শুরু হয়।

শর্ট কোর্স (সাঁতার) : স্বল্পপাল্লার সাঁতারকে বলা হয় 'শর্ট কোর্স'। শর্ট কোর্সের দূরত্ব হতে হবে কমপক্ষে ২২.৮৬ মিটার (২৫ গজ) ও সর্বাধিক ৪৫.৭২ মিটার (৫০ গজ)।

ডিঙ্ক (টেনিস ও ভলিবল) : বিপক্ষের কোর্টে আলতো করে বল পাঠানো। এতে বল নেটের ঠিক ওপর দিয়ে বল বিপরীত কোর্টে পড়ে।

ডিজএনগেজমেন্ট (ফেন্সিং) : প্রতিদ্বন্দ্বীর অসিকে অন্য পথে চালিত করে আক্রমণ করাকে বলে 'ডিজএনগেজমেন্ট।'

এক্স-রিং (শুটিং) : টার্গেটের একেবারে কেন্দ্রবিন্দু ভেদ করতে পারলে বলা হয় 'এক্স-রিং' করেছেন। স্মল-বোর প্রতিযোগিতায় টাই ব্রেক করতে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকরুম (টেনিস) : টেনিস কোর্টের বেস লাইন ও পেছনের পরদার (বলবয়রা যেখানে থাকে) মধ্যবর্তী অংশকে বলা হয় 'ব্যাক রুম'।

বেল ল্যাপ (অ্যাথলেটিক্স) : দূরপাল্লার দৌড়ে শেষ ল্যাপের আগে বেল বাজিয়ে প্রতিযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই শেষ ল্যাপের নাম 'বেল ল্যাপ'। অবশ্য অনেক সময় বন্দুক থেকে গুলি ছুড়েও জানান দেওয়া হয়। তখন এর নাম হয় 'গান ল্যাপ'।

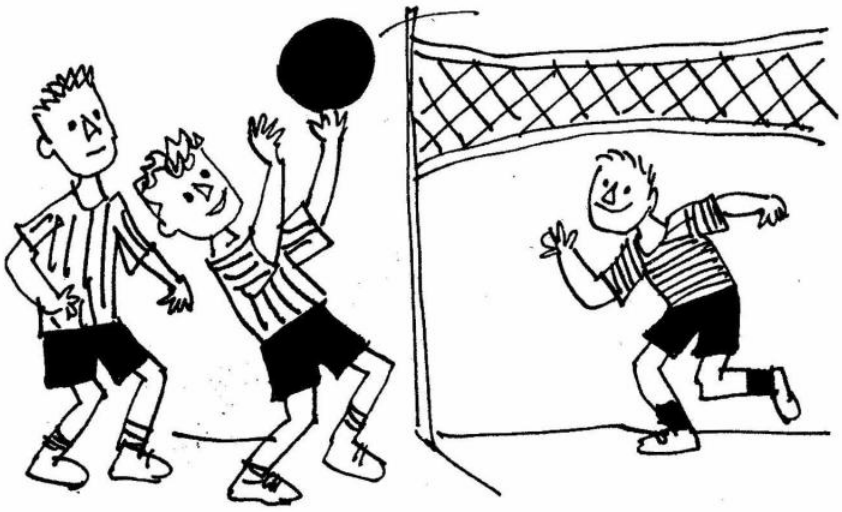

সিডনিতে গেইল ডেভার্স করতে চান সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক

একসময় মারাত্মক গলগণ্ডের অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন গেইল ডেভার্স। সুস্থ হয়ে অ্যাথলেটিক্সে একের পর এক সোনা জিতে সবাইকে অবাক করে দেন তিনি। ওলিম্পিকেও করতে চলেছেন সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক। লিখেছেন প্রতাপ জানা

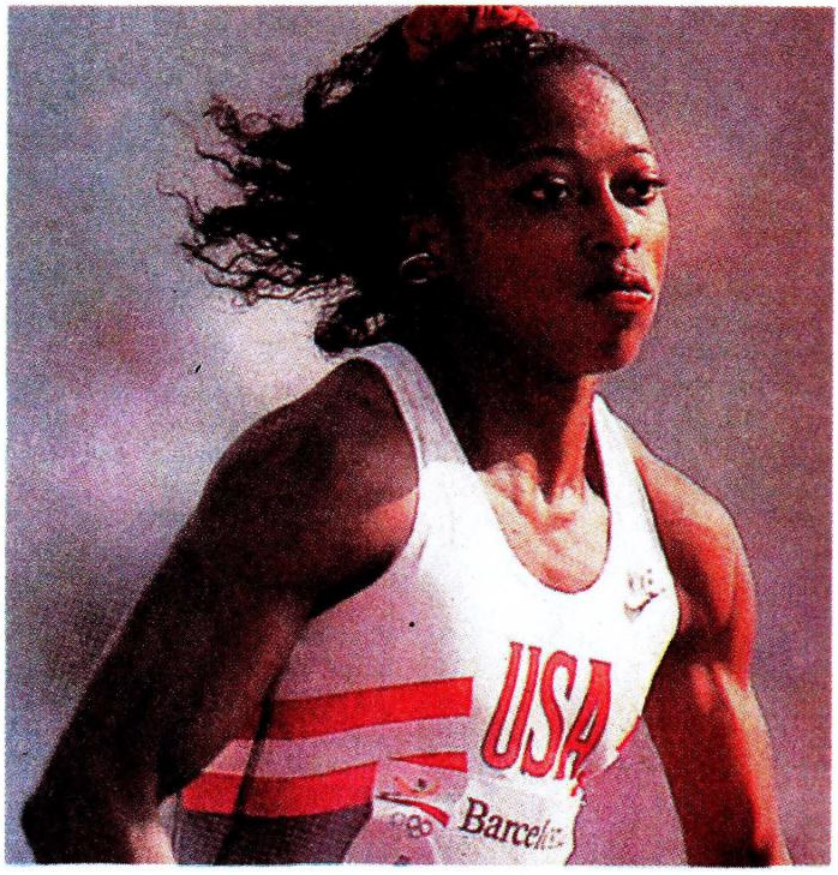

সেভিলের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে মেয়েদের ১০০ মিটার হার্ডল্‌স রেস শেষ হওয়ার ঠিক পরের মুহূর্তের ঘটনা। চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর মার্কিন মেয়ে গেইল ডেভার্স জড়িয়ে ধরেছিলেন ব্রোঞ্জজয়ী, সুইডিশ প্রতিনিধি লুডমিলা এনকুইস্টকে। তখন দু'জনেরই চোখে জল। এর পর দু'জনে একসঙ্গে নিজেদের দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে যখন গোটা স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করছিলেন, তখন স্টেডিয়ামের উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই দুই বীরাঙ্গনাকে।

দর্শকদের অভিনন্দন ছিল এঁদের দু'জনের অসাধারণত্বের জন্য, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে হার-না-মানা মানসিকতার জন্য এবং এঁদের আদর্শ খেলোয়াড়ি মনোভাবের জন্যও। লুডমিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত। আর ডেভার্স মারাত্মক গলগণ্ডের অসুখে মৃত্যুর কিনারা থেকে ফিরে এসেছেন। এঁদের দু'জনের অদম্য মনোবল ও অপরিসীম লড়াকু মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উদ্বেল হয়েছিলেন সেদিন স্টেডিয়ামের উপস্থিত সবাই।

১৯৯১ সাল থেকে প্রতিটি ওলিম্পিক ও বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপের আসরে কমপক্ষে একটি করে পদক জিতেছেন ডেভার্স। হয় ১০০ মিটার কিংবা ৪০০ মিটার রিলে, নয়তো ১০০ মিটার হার্ডল্‌সে। গত আটলান্টা ওলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে তিনি পেয়েছিলেন সোনা। ৪০০ মিটার রিলেতে আরও একটি সোনা। বার্সেলোনা ওলিম্পিকেও তাই। ষাটের দশকে উওমিয়া টিয়াস ছাড়া মেয়েদের মধ্যে আর কেউই ডেভার্সের মতো পরপর দুটি ওলিম্পিকে ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ান হতে পারেননি। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে গেইল ডেভার্স জিতেছেন মোট পাঁচটি সোনা। এত বেশি সোনা আর কোনও মহিলা অ্যাথলিটের দখলে নেই। আটলান্টা ওলিম্পিকে ট্রিপ্‌ল জাম্পে সোনা জিতেছিলেন কেনি হ্যারিসন —গেইল ডেভার্সের স্বামী।

মারিয়ান জোন্সের ধাক্কায় ১০০ মিটার দৌড় থেকে সরে গেছেন গেইল ডেভার্স। মার্কিন ট্রায়ালে তিনি এবার ওলিম্পিকের যোগ্যতামান পার হয়েছেন ১০০ মিটার হার্ডল্‌স ও ৪০০ মিটার রিলেতে। সিডনিতে তিনি অংশ নেবেন এই দুটি ইভেন্টে। সোনা জিতলে, ওলিম্পিকে সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক হবে তাঁর। আর তিনি সিডনিতে জোড়া সোনা পেলে, তৈরি হবে এক নতুন রেকর্ড—জোড়া সোনা জয়ের হ্যাটট্রিক।

ওলিম্পিকে যাঁর এমন কীর্তি, অথচ তাঁর জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন তিনি রানিং ট্র্যাকে ফিরে আসা তো দূরের কথা, কোনওদিন সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন কি না—এ নিয়ে চিকিৎসকদের মনেও ছিল দারুণ সন্দেহ। গলগণ্ডের অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। হাঁটার শক্তি একরকম হারিয়েই ফেলেন। পরে সঠিক চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর পরের ইতিহাস তাঁর উজ্জ্বল প্রত্যাবর্তনের। ঐতিহ্য বজায় রেখে সিডনিতেও কি গেইল ডেভার্স সোনা জিততে পারবেন?

ফুলব্যাক

মানস চক্রবর্তী

আজকের প্রজন্মের কাছে শৈলেন মান্নার নাম হয়তো তেমনভাবে পৌঁছয়নি। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তিনি এক প্রবাদপুরুষ। খেলার মাঠের বাইরেও তাঁর জীবন নানা নাটকীয় মুহূর্তে উচ্ছল। বলিষ্ঠ ও ঋজু চরিত্রের এই মানুষটির পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে এই ধারাবাহিক রচনায়।

২৭

ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে নেওয়ার কাজটা যদি শৈলেন মান্নার আমলে শুরু হয়, তবে তার পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল যাঁদের আমলে তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুই ফুটবলার হলেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চুনী গোস্বামী। দু'জনের মধ্যে প্রদীপ মানে ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের সেরা বর্ণময় পি কে সামান্য বড় চুনীর চেয়ে। ময়নাগুড়িতে জন্ম প্রদীপের। বেড়ে উঠেছেন জামশেদপুরে। সেখান থেকেই কলকাতায় খেলতে আসেন। স্বপ্ন ছিল মোহনবাগানে খেলার। কিন্তু মোহনবাগান সেভাবে তাঁকে সমাদর করেনি। পরে অবশ্য মোহনবাগানের হয়ে বিদেশ সফর করলেও প্রদীপ প্রথমে এরিয়ান এবং পরে ইস্টার্ন রেলে খেলেই ভারতবিখ্যাত হন। রেলে থেকেই তিনি মেলবোর্ন ওলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। রোম ওলিম্পিকেই ভারত শেষবার ফুটবলে খেলে। সেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন পি কে। '৬২ সালের এশিয়ান গেম্‌সে ভারত চ্যাম্পিয়ান হয়। অধিনায়ক ছিলেন চুনী। ফাইনালে ভারত দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-১ গোলে হারায়। একটি গোল পি কে-র। ফিফার ফ্যাক্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্‌স কমিটি তাঁকে শতাব্দীর সেরা ভারতীয় ফুটবলারের সম্মান দিয়েছে।

পি কে খেলতেন রাইট আউটে। শুরুর দিকে তাঁর কাজটা সহজ ছিল না। প্রথমত, তিনি যখন ময়দানে খেলতে আসেন তখনও কলকাতা তথা ভারতবাসীর মনে বেঙ্কটেশের মনোমোহিনী ফুটবলের রঙিন ছবি অম্লান। বেঙ্কটেশের জায়গায় নতুন একজন ফুটবলারকে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না কলকাতা। কিন্তু নিজের পরিশ্রম, আন্তরিকতা, অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি অসাধারণ নৈপুণ্যে পি কে ভারতীয় ফুটবলে নিজের আসনটি পাকা করে নিলেন। শৈলেন মান্না বলছিলেন, "দু'জনকেই দেখেছি। বিরুদ্ধেও খেলেছি। সামলাতে কখনও পেরেছি, কখনও পারিনি। বেঙ্কটেশ এবং পি কে। ভারতীয় ফুটবলে দু'জনেই দিকপাল। বেঙ্কটেশ যখন দাপিয়ে খেলছে তখন আমি টপ ফর্মে। প্রদীপ যখন জামশেদপুর থেকে এসে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেল তখন আমি অবসর নেওয়ার মুখে। ওরা দু'জন দু' যুগের ফরওয়ার্ড। কিন্তু দু'জনেরই খেলা এখনকার আধুনিক ফুটবলে সমান কার্যকর হত। প্রদীপের সেরা অস্ত্র ছিল ওর গতি। মারাত্মক গতির সঙ্গে ভয়ঙ্কর শট ও যথেষ্ট জোরালো ও লক্ষ্যে অবিচল হেডিং। নিক্তির সূক্ষ্ম বিচারে হয়তো এই তিনটি গুণেই প্রদীপ এগিয়ে বেঙ্কটেশের চেয়ে। কিন্তু বেঙ্কটেশের ছিল প্রখর ফুটবলবোধ। পায়ে বল থাকুক না থাকুক, মাঠে যেন বেঙ্কটেশের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সর্বদা কাজ করত। বেঙ্কটেশের মতো অমন ধূর্ত উইঙ্গার আমি আমার গোটা ফুটবল-জীবনে খুব কম দেখেছি। "তাই বলব, প্রদীপের চেয়ে বেঙ্কটেশকে

আটকাতেই আমাকে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়েছে ম্যাচে কী করে আটকাব তাই ভাবতে। বেঙ্কটেশকে আমি সবসময় চাইতাম আমার ডান দিকে টেনে আনতে। বস্তুত আমি ডান পায়ের ফুলব্যাক। বাঁ পায়ের চেয়ে ডান পায়েই ট্যাক্‌লিংয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু ধূর্ত বেঙ্কটেশ একটা অদ্ভুত কায়দায় শেষ মুহূর্তে 'আউট সাইড ডজ মারত। কখনও ও জিতত। কখনও আমি। কিন্তু বুদ্ধির লড়াইটা ভীষণ ছিল। আসলে বেঙ্কটেশের ফুটবল ছিল আপাদমস্তক স্কিলফুল।

"পাশাপাশি প্রদীপের ছিল গতি শুটিং, পাওয়ার, হেডিং-এর ঝোড়ো সমাহার। তার জন্য আমার থাকত অন্য পরিকল্পনা। প্রদীপ যখন প্রদীপ হল, তখনও কিন্তু আমি বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রোফি খেলছি। যতই অবসর নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকি না কেন, আমি চেষ্টা করতাম প্রদীপের গতিটাকে কমানোর। ওর গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা আমার সেই বয়সে ছিল না। বল ধরে খেলে, পায়ে যথাসম্ভব বেশিক্ষণ রেখে আমার চেষ্টা থাকত প্রদীপকে মন্থর করে তোলা। তবে প্রদীপের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই ততটা না হলেও চলত। যতটা লড়তে হত বেঙ্কটেশের সঙ্গে।

"তবে প্রদীপকে আমি প্রথম থেকেই দেখছি অসম্ভব লড়াকু। কোনও কিছুতেই হার মানা যেন ওর ধাতে নেই। সে ফুটবলার হিসেবেই বলুন, কি কোচ হিসেবে। অনেকের ধারণা, কোচ হওয়ার জন্যই প্রদীপ এত জনপ্রিয়। আমি তা মনে করি না। ওর মতো ফুটবলার ভারতে খুবই কম জন্মেছে। ভারতের সর্বকালের সেরা দলে ওকে রাখতেই হবে। প্রদীপের পর আরও অনেক বড় মাপের রাইট উইঙ্গার এসেছে। তারা ঘরোয়া ফুটবলে যথেষ্ট সফল। কেউ কেউ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। কিন্তু কেউই প্রদীপ নয়। ও-ই ভারতের আন্তর্জাতিক মানের সেরা উইঙ্গার।

"প্রদীপ কেন মোহনবাগানে খেলল না সেটা একটা রহস্য। আসলে ও যখন মোহনবাগানে খেলবার জন্য এল সেই বছরেই মোহনবাগানে বেঙ্কটেশ এল। বলাই বাহুল্য, বেঙ্কটেশকে ফেলে কেউই তখন প্রদীপকে নেবে না। তাই ওকে এরিয়ানে যেতে হল। '৫৪ সালে প্রদীপ এরিয়ানেও যে খুব ভাল খেলল তা নয়। তবে '৫৫তে ইস্টার্ন রেলের বাঘা সোমের হাতে পড়ে ওর ফুটবলের খোলনলচে বদলে গেল। '৫৫-এর লিগ এবং শিল্ডে ভাল খেলার জন্যই প্রদীপকে আমরা নিয়ে গেলাম দূর প্রাচ্য সফরে। তার আগে '৫৫-তে ভারত চতুর্দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ান হল। সেবার খেলা হয়েছিল ঢাকায়। আমি সেই টিমে ছিলাম না। ভারতের নেতৃত্ব দিয়েছিল আজিজউদ্দিন। সেবার শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত গোল করেছিল প্রদীপ। সেজন্য মোহনবাগানের প্রথম বিদেশ সফরে ওকে আমরা নিয়ে যাই। ফিরে আসার পর ওকে মোহনবাগানে খেলার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু বাঘাদার কোচিং ছেড়ে ও আসতে চাইল না। তা ছাড়া ততদিনে ও রেলে টিকিট কালেক্টরের চাকরিও পেয়ে গিয়েছে। মোহনবাগানে আসতে হলে ওই চাকরিটা ছেড়ে আসতে হত। প্রদীপ ঝুঁকি নেয়নি। আজ এতদিন পরে মনে হচ্ছে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। মোহনবাগানে খেললে এর চেয়ে বেশি কী আর পেত ও? মোহনবাগানে না খেলেও তো ও ভারতসেরা। বরং রেলে খেলে নিজের টিমকে লিগ চ্যাম্পিয়ান করেছে। কলকাতা ফুটবলে তিন প্রধান ছাড়া লিগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে শুধু ইস্টার্ন রেল। এবং তার পেছনে প্রদীপের অবদান সবচেয়ে বেশি।"

প্রদীপ ব্যানার্জিকে শৈলেন মান্না দেখেছেন বিভিন্ন সময়ে। প্রথমে ফুটবলার হিসেবে। পরে কোচ হিসেবে। বিশেষ করে '৭৬ সালে পি কে যখন মোহনবাগানে কোচ হয়ে আসেন তখন মোহনবাগানে ঘোর অন্ধকার। আগের বছর আই এফ এ শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোল খাওয়ার পর খুবই করুণ অবস্থা মোহনবাগানে। এই সময় পালতোলা নৌকোর হাল ধরেন পি কে। এবং ছ' বছরের অন্ধকার কাটিয়ে পি কে-র কোচিংয়ে মোহনবাগান তাঁবুতে আলো জ্বলে। তখন শৈলেন মান্না ছিলেন মোহনবাগানের সহ-সচিব। এরং অঘোষিত ম্যানেজার। রিক্রুট করা থেকে শুরু করে দলের সঙ্গে হিল্লিদিল্লি করা ছিল তাঁর কাজ। সচিব ধীরেন দে হলেও প্লেয়ারদের সব আবদার ছিল 'মান্নাদা'র কাছে। এবং যথার্থ প্লেয়ার্স ম্যান হিসেবে মান্না সব আবদার সামলাতেন হাসিমুখে। প্লেয়ারদের ভালবাসতেন যেমন, তেমনই শাসন করতেন। তবে কোনও সময়েই পি কে-র কোচিংয়ে হস্তক্ষেপ করেননি। পি কে-র কোচিং সম্পর্কে শৈলেন মান্না যথার্থ শ্রদ্ধাশীল।

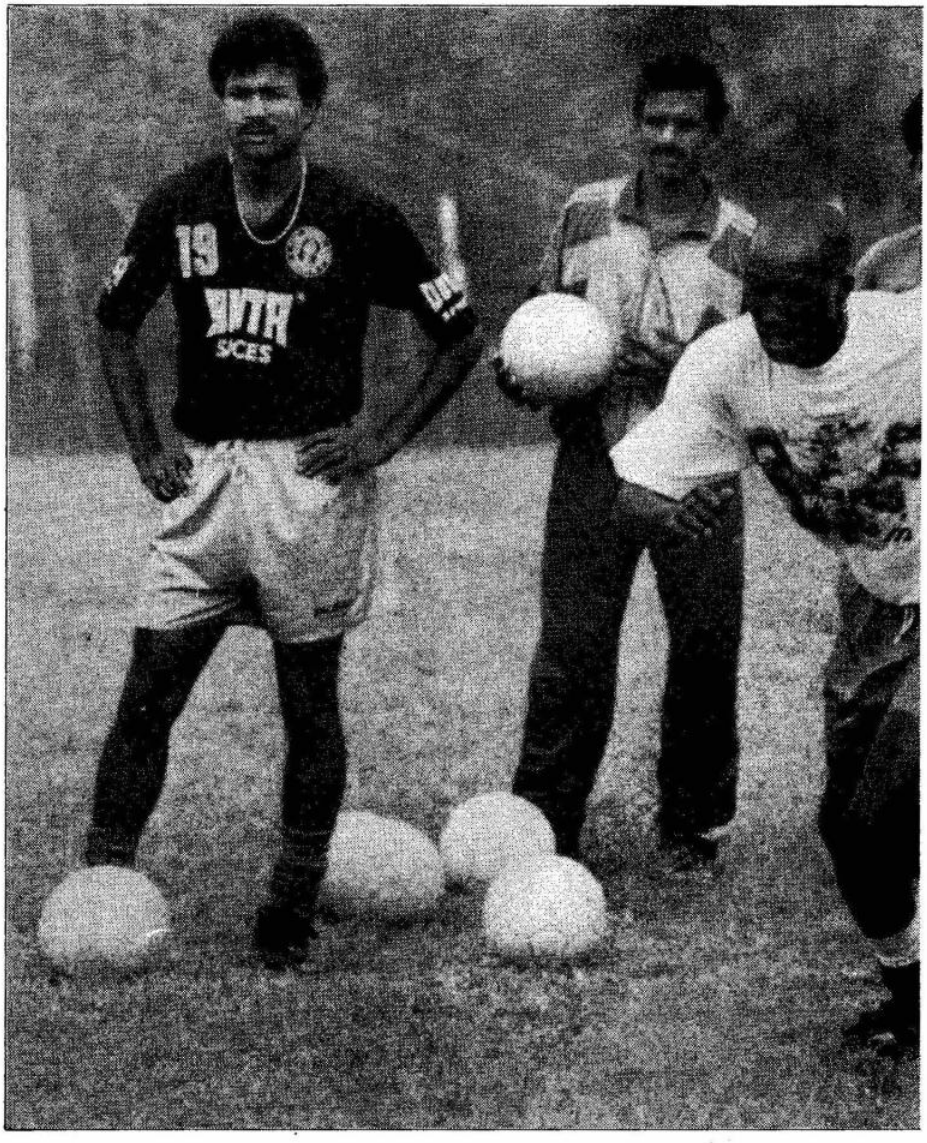

বলছিলেন, "রহিমসাহেবের কোচিংয়ে আমরা তো খেলেইছি। ক্লাব এবং আন্তর্জাতিক—দুটোতেই রহিমসাহেব প্রচণ্ড সফল। তবে পি কে কিন্তু ক্লাব-ফুটবলে ছাপিয়ে গেছে রহিমসাহেবকে। ম্যান ম্যানেজমেন্টে পি কে-র কাছে কেউ নেই। মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গল—দুই দলেই ও সফল।"

খুব একটা ভুল বলেননি শৈলেন মান্না। '৭২ থেকে '৭৯—টানা আট বছর পি কে শিল্ড চ্যাম্পিয়ান দলের কোচ। প্রথম চার বছর ইস্টবেঙ্গলের। শেষ চার বছর মোহনবাগানের। '৮০ সালে লিগ ও শিল্ড বাতিল হয়ে যায়। পরের বছর পি কে চলে যান ভারতীয় ফুটবলের কোচিং করাতে। না হলে টানা চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ডটা কোথায় যেত কে জানে! ওই আট বছরে পি কে-র দল সাতবার লিগ চ্যাম্পিয়ান। এর সঙ্গে ডুরান্ড, রোভার্স, বরদলৈ, ডি সি এম—সব মিলিয়ে কোচিং-জীবনে পি কে জিতেছেন ৪৪টি ট্রোফি। ভারতের কোনও কোচের এই কৃতিত্ব নেই।

বড় ফুটবলার সবসময়ে বড় কোচ হবেন, এমন কোনও কথা নেই। সাধারণত তাঁরা তা হনও না। এটাই নিয়ম। এবং নিয়মের বড় ব্যতিক্রম হলেন পি কে।

যেমন চুনী গোস্বামী। তাঁর মতো ফুটবলার গোটা বিশ্বেই বিরল। ভারতের সর্বকালের সেরাদের অন্যতম। অনেকের মতে সর্বকালের সেরা। চুনী সামান্য কয়েকদিন কোচিং করিয়েছেন মোহনবাগানে। তেমন সাফল্য পাননি। অথচ পি কে-র মতো তাঁরও ফিফা কোচিংয়ে প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রি আছে। তবে চুনী কোচিং করিয়েছেন কি না, তাতে কিছু যায় আসে না। '৫৪ থেকে '৬৭—টানা ১২ বছর তিনি মোহনবাগানে খেলে গেছেন। ছয়ের দশকে মোহনবাগানের সাফল্যের মূলে ছিলেন চুনী। মোহনবাগান ছাড়া কখনও কোনও টিমে খেলেননি। তাঁর পায়ে ছিল জাদু। অবলীলায় কাটিয়ে যেতে পারতেন তিন-চার-পাঁচজনকে। মূলত ডান পায়ের ফুটবলার চুনী। তবে রাইট ইনের মতো লেফ্‌ট ইনেও সমান স্বচ্ছন্দ ছিলেন। মোহনবাগানে প্রথম দু'বছর তাঁকে কাটাতে হয়েছে সাত্তার ও বক্রু ব্যানার্জির ছায়ায়। তবু বলাইদাস চ্যাটার্জির স্নেহছায়ায় নিজেকে গড়ে তুলেছেন তিনি।

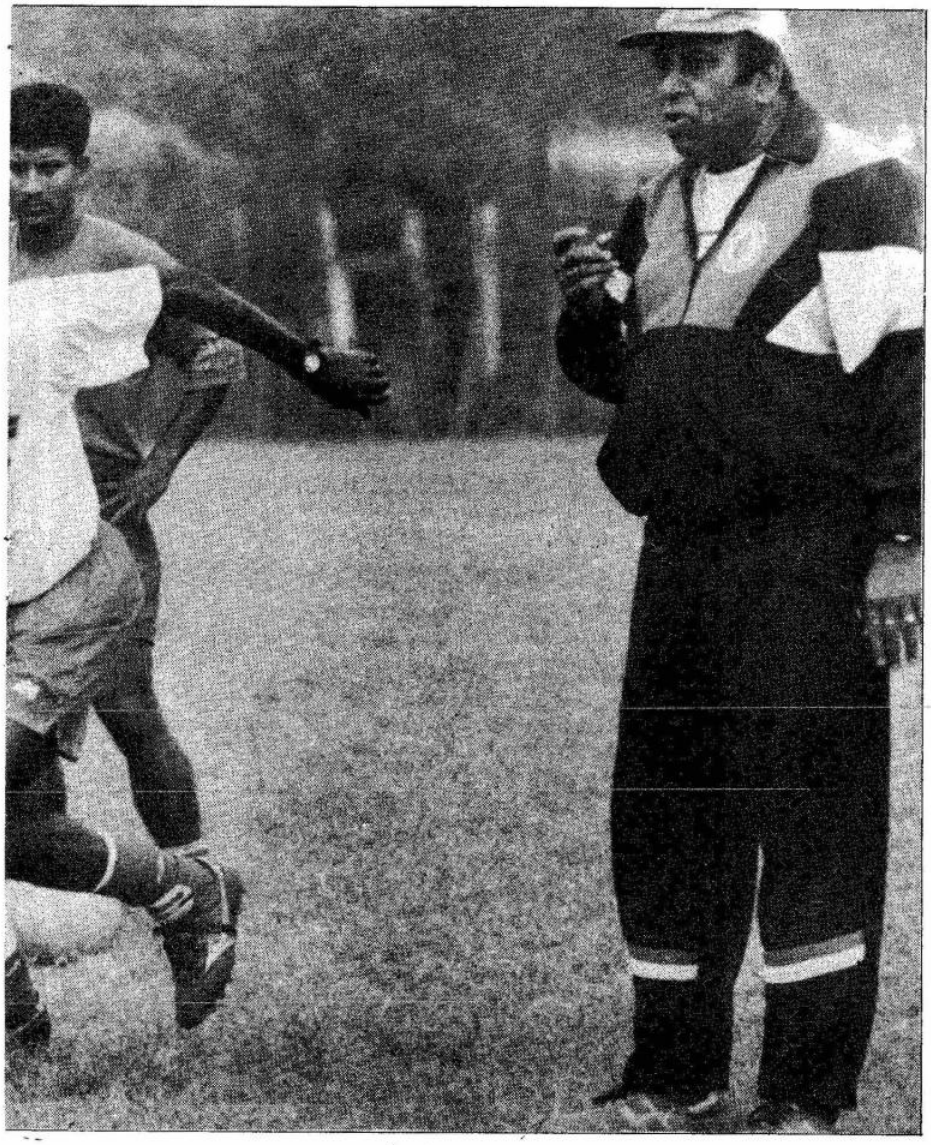

মোহনবাগানের হয়ে চুনীর প্রথম ম্যাচের কথা বলছিলেন শৈলেন মান্না। "সেই বছর দলে চারজন ইন ম্যান। পঞ্চম ইন ম্যান হল চুনী। সাত্তার, বক্রু, রুনু গুহঠাকুরতা এবং রবিন পাত্র। সাত্তার ও রুনু ওলিম্পিয়ান। রবিন পাত্র সেবার এসেছিল হাওড়া ইউনিয়ন থেকে। বেশ ভাল খেলে। ওরাই খেলবে। সেবার মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পিয়ান হলেও প্রথম চারটে ম্যাচের মধ্যে তিনটি ড্র হয়েছিল। পঞ্চম ম্যাচ ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। তখন ইস্টার্ন রেল বেশ ভাল দল। আমরা আগের দিন ঠিক করতে পারছিলাম না কী টিম হবে। বক্রুর এক আত্মীয় মারা গেছে। খেলতে পারবে কি না ঠিক নেই। রুনুর পোর্ট কমিশনার্সে চাকরি।

ওঁর নাইট ডিউটি পড়েছে। সাত্তার চাকরি পেয়েছে বার্ড কোম্পানিতে। তাকে মিলে যেতেই হবে। কী করে টিম হবে? উমাপতি কুমার তখন ফুটবল সচিব। বলাইদা কোচ। সবাই মিলে ঠিক করলাম রবিন খেলবে লেফ্‌ট ইনে। বক্রু না এলে রাইট ইন চুনী। সেইমতো কুমারবাবুর অস্টিন গাড়ি নিয়ে চুনীকে আনতে গেল ক্লাবের এক কর্তা। ততক্ষণে আমরা সবাই পৌঁছে গিয়েছি। রতন সেন, বেঙ্কটেশ, কেষ্ট পাল, কেষ্ট দত্ত—সবাই এসে গিয়েছে। ওরই মধ্যে দেখলাম বলাইদা চুনীকে বলল, আগে জার্সি পরে নিবি। আমি তো বুঝলাম কেন এই কথা বলল। সবাই আগে মোজা ও বুট পরে। মোজার তলায় থাকে অ্যাঙ্কলেট। রবিন পাত্রের খালি গা। ও মোজা পরছে। চুনী কিন্তু বলাইদার কথামতো আগে জার্সি পরে ফেলেছিল। এই সময় তাঁবুতে বিরাট শোরগোল। বক্রু এসে গিয়েছে। তার মানে ও খেলবে রাইট ইনে। লেফ্‌ট ইনে খেলবে রবিন। কিন্তু মোহনবাগানের কুসংস্কার হচ্ছে একবার কেউ জার্সি পরে ফেললে তা খোলা যায় না। কুমারবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম চুনী যখন জার্সি পরে ফেলেছে, তখন ওকেই খেলতে দিন। কুমারবাবু চুনীকে জিজ্ঞেস করলেন লেফ্‌ট ইনে খেলতে পারবে? চুনী অক্লেশে বলে দিল, হ্যাঁ। এবং ম্যাচের আট মিনিটেই মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোল করল। আমরা ম্যাচটা জিতেছিলাম ৩-০ গোলে। বাকি দুটো গোল কেষ্ট পাল ও বক্রু ব্যানার্জির। সেই ম্যাচটাই জন্ম দিয়ে গেল ভারতের সর্বকালের সেরা তারকা ফুটবলারের।"

(ক্রমশ)

খেলার খবর

ওলিম্পিকে বাংলার সাত

শেষ কবে বাংলা থেকে সাতজন ক্রীড়াবিদ ওলিম্পিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন? বাংলার ক্রীড়াজগৎ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল অনেক বিশেষজ্ঞই উত্তর দিতে সময় নেবেন। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রকে উদ্বুদ্ধ করবে। সাত ক্রীড়াবিদ হলেন—লিয়েন্ডার পেজ, বলজিৎ সিংহ সাইনি, পৌলমী ঘটক, সরস্বতী দে, সুমা বিশ্বাস, সঞ্জয় রাই এবং শান্তা ঘোষ। শান্তা জার্মানির হয়ে ওলিম্পিকে দৌড়লেও আদতে তিনি বাংলারই। দেশকে, বাংলাকে তিনি মোটেই ভোলেননি। বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য বাবার কাছে আবদারও করেন। সুতরাং তিনি আমাদের ঘরের মেয়ে, একদিক দিয়ে বাংলারই প্রতিনিধি। লিয়েজার পেজ গতবার টেনিসের ব্যক্তিগত পদকজয়ী, এবার ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ছাড়াও মহেশ ভূপতিকে সঙ্গী করে ডাবল্‌স লড়াইয়ে নামবেন। আশা করা যায়, টেনিসের অন্তত একটি পদক এনে দেবেন লিয়েন্ডার এবং মহেশ। হকির বলজিৎ সিংহ সাইনি এবার জাতীয় দলের অন্যতম স্টার। সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে বলা যায়, ভারত পদকের দাবিদার। লংজাম্পার সঞ্জয় রাই আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা, কর্মসূত্রে দীর্ঘদিনই এই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। দক্ষ সঞ্জয় আট মিটার পর্যন্ত লাফিয়েছেন। ওলিম্পিকের ট্র্যাকেও দৌড়বেন সঞ্জয়। দৌড়বেন সরস্বতী দে-ও। এশীয় মিটে রুপো জিতে আসা সরস্বতী ত্রিপুরার মেয়ে হলেও এখানেই তাঁর দৌড়ের স্বীকৃতি। সুমা বিশ্বাস হেপ্টাথলনে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে এসেছেন ৩৮ নম্বরে। ওলিম্পিকের ময়দানে তিনিও অন্যতম আকর্ষণ। আর আছেন পৌলমী ঘটক। প্রতিভাময়ী ও লড়াকু পৌলমী অনেকটা এগিয়েছেন। ওলিম্পিকে যাচ্ছেন শিখতে। সব মিলিয়ে মোট সাতজন। এঁরা বাংলার আশা, ভবিষ্যতেও এঁদের ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে।

সেরা রেফারিরা জাপানে

নিজেদের ফুটবল মান উন্নত করার জন্য জাপানের ফুটবল সংস্থা শুধু বিদেশ থেকে সেরা খেলোয়াড়দেরই সে-দেশে নিয়ে যাচ্ছে না, আমন্ত্রণ করে আনছে বিশ্বের সেরা রেফারিদেরও। 'জে' লিগের খেলা পরিচালনা করছেন এঁরা। এতে খেলোয়াড়রা যেমন খেলার নিয়মকানুন জানতে পারছেন, তেমনই স্থানীয় রেফারিরাও খেলা পরিচালনার কায়দাকানুন শিখে নিতে পারছেন। ১৯৯৩ সালে জাপানে জে লিগ চালু হয়।

মোট ২৯ জন রেফারি জাপানে গেছেন। সবচেয়ে বেশি রেফারি ইউরোপের, মোট ১৩ জন। অনেক রেফারি জাপানে একাধিক মরসুমেও খেলা পরিচালনা করেছেন। যুগোস্লাভিয়ার জোবান পেত্রোভিচ ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭—মোট চার মরসুমে খেলিয়ে গেছেন জাপানে, স্কটল্যান্ডের লেসলি মোতারাম ১৯৯৬-এ এসেছেন, এবার নিয়ে তাঁর পঞ্চম মরসুম চলছে। 'স্টার' রেফারিদের মধ্যে জে লিগে খেলিয়েছেন, ব্রাজিলের উইলসন সুজা, স্পেনের জোস মারিয়া গার্সিয়া-আরান্দা এবং মরক্কোর সৈদ বেলকোলা। বেলকোলা ১৯৯৮-এর বিশ্বকাপ ফাইনালের রেফারি ছিলেন।

সাপে কাটা ময়দান

সাপ কি কলকাতা ময়দানের ফুটবল ম্যাচ থামিয়ে দিতে পারে? উত্তর, অবশ্যই হ্যাঁ। দিনকয়েক আগে কোল ইন্ডিয়া বনাম ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স দলের অফিস লিগ ম্যাচ শুরুর আগে দেখা যায় সামনের ঝোপঝাড় থেকে দুটি সাপ বেরিয়ে এসেছে। খেলোয়াড়রা তখন অনুশীলন করছিলেন। তাঁরা ঘটনাটা রেফারিকে জানান। হতভম্ব রেফারিই বা কী করবেন! ভীত, সন্ত্রস্ত দু' দলের ফুটবলারই তখন ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেন। কারণ সাময়িকভাবে সাপ দুটি ঝোপে ফিরে গেলেও আবার যে-কোনও সময়ে বেরিয়ে আসতেই পারত! প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচ খেলতে স্বাভাবিকভাবেই রাজি হননি খেলোয়াড়রা। বাধ্য হয়ে রেফারি খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। কলকাতা ফুটবলের অবস্থা যে কোন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। মান তো নেমেই ছিল কিন্তু ময়দানের পরিচর্যাও যে এতটুকু হয় না, তাও বোঝা গেল। সংশ্লিষ্ট ফুটবল কর্মকর্তারা কবে এসব নিয়ে একটু ভাবার সময় পাবেন, কে জানে!

দর্শক

ফোটো : অশোক চক্রবর্তী

চুল ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা

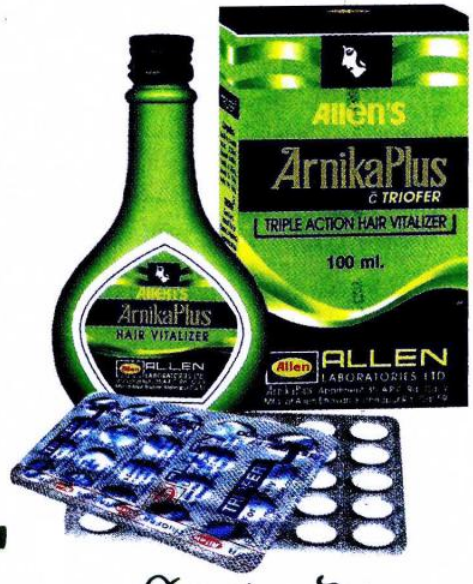

আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপ্‌ল অ্যাক্‌শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার

সময় না হতেই চুলে পাক্ ধরছে?
অতিরিক্ত চুল পড়া, খুস্কি এসব নিয়ে নাজেহাল?
এসবই কিন্তু রোগ নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র এবং শরীরের আভ্যন্তরীন গোলযোগের প্রভাব।
যেমন পেটের গোলমাল, অসুস্থ লিভার, রক্তাল্পতা অথবা শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের ঘাটতি।
সমস্যার সমাধান কিন্তু কোন সাধারণ তেল বা প্রসাধনী শ্যাম্পু নয়। এক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন খাওয়ার ওষুধ **ট্রায়োফার**, সঙ্গে চুলের গোড়ায় লাগাবার ওষুধ তেলবিহীন **আর্নিকাপ্লাস** - এর নিয়মিত ব্যবহার।

চুল নিয়ে সমস্যার সমাধানে **আর্নিকাপ্লাস-ট্রায়োফার** ট্রিপ্‌ল অ্যাকশন হেয়ার ভাইটালাইজার ডাঃ সরকারের একটি বিশেষ ফলপ্রসু আবিষ্কার।

লিভোসিন

আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার

আর লিভারের সুরক্ষায়

লিভোসিন

"সর্বাধিক রোগের কারণ – পেটের গণ্ডগোল ও অসুস্থ লিভার এবং নানা কারণে মানসিক চাপজনিত রাতে ঘুম না হওয়া।"

কোষ্ঠকাঠিন্য সারাতে, ক্ষুধা ও হজম শক্তি বাড়াতে, অম্লরোগ, গ্যাস ও ক্লান্তি তাড়াতে, পেট পরিস্কার রাখতে ও লিভারের যত্ন নিতে নিয়মিত **লিভোসিন** সেবন করুন।

যা আপনাকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন ফিরে পেতে সাহায্য করে।

Jupiter Allen

Mktd. by : **JupiterAllen (India) Limited**
Corp.Office :Allen Estate, Krishnapur Road, Calcutta-700 059,
Ph.:5717273, Fax:5712121, E-mail: allenlab@vsnl.com

Jupiter · Allen · Allen's · Emars
Dr. Sarkar Group
Serving for a better future

ANANDAMELA 20 SEPTEMBER 2000 REGD NO. WB/RNP/183 & WB/RNP/PGN/05
MH/MBI-SOUTH/683/97/TN/MS (C) 731. RNI NO. 27057/75 RS. 10.00

আপনার জামাকাপড় কি উজালা সাদা?

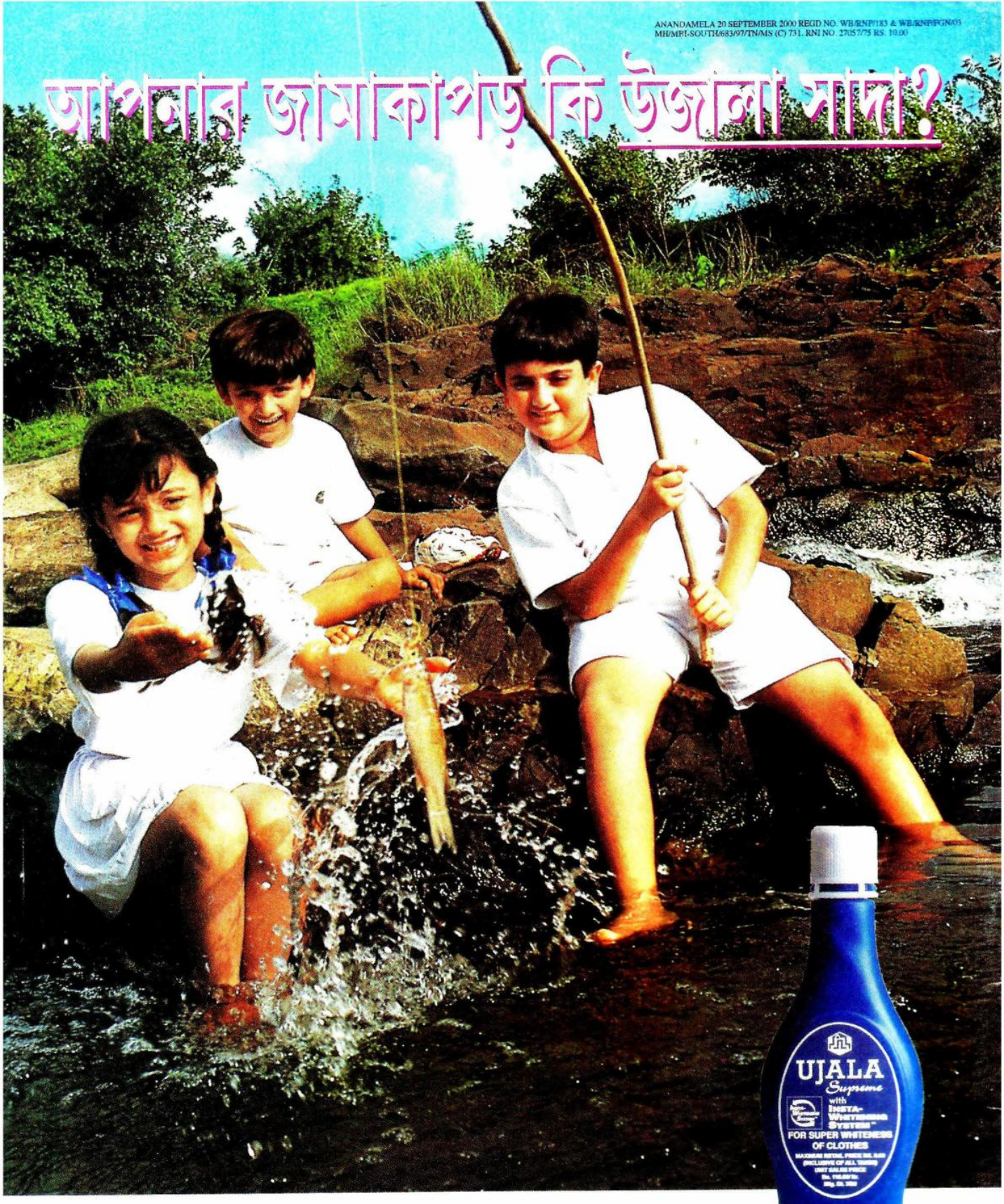

একমাত্র উজালা সুপ্রীমে আছে অভিনব **ইনস্টা হোয়াইটেনিং সিস্টেম**™ (IWS), যা আপনার জামাকাপড়ে এনে দেয়, এক চোখধাঁধানো উজ্জ্বলতা। এবং উজালার এমনই শক্তি যে লিটার জলে মাত্র চার ফোঁটাই যথেষ্ট। তাই কেবল উজালাই দিতে পারে এক নতুন সাদা - **উজালা সাদা**।

শুভ্রতার নতুন রং

A product of Jyothy Laboratories Ltd. উজালা সুপ্রীম এখন বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে।